নির্বাচিত ছোটগল্প

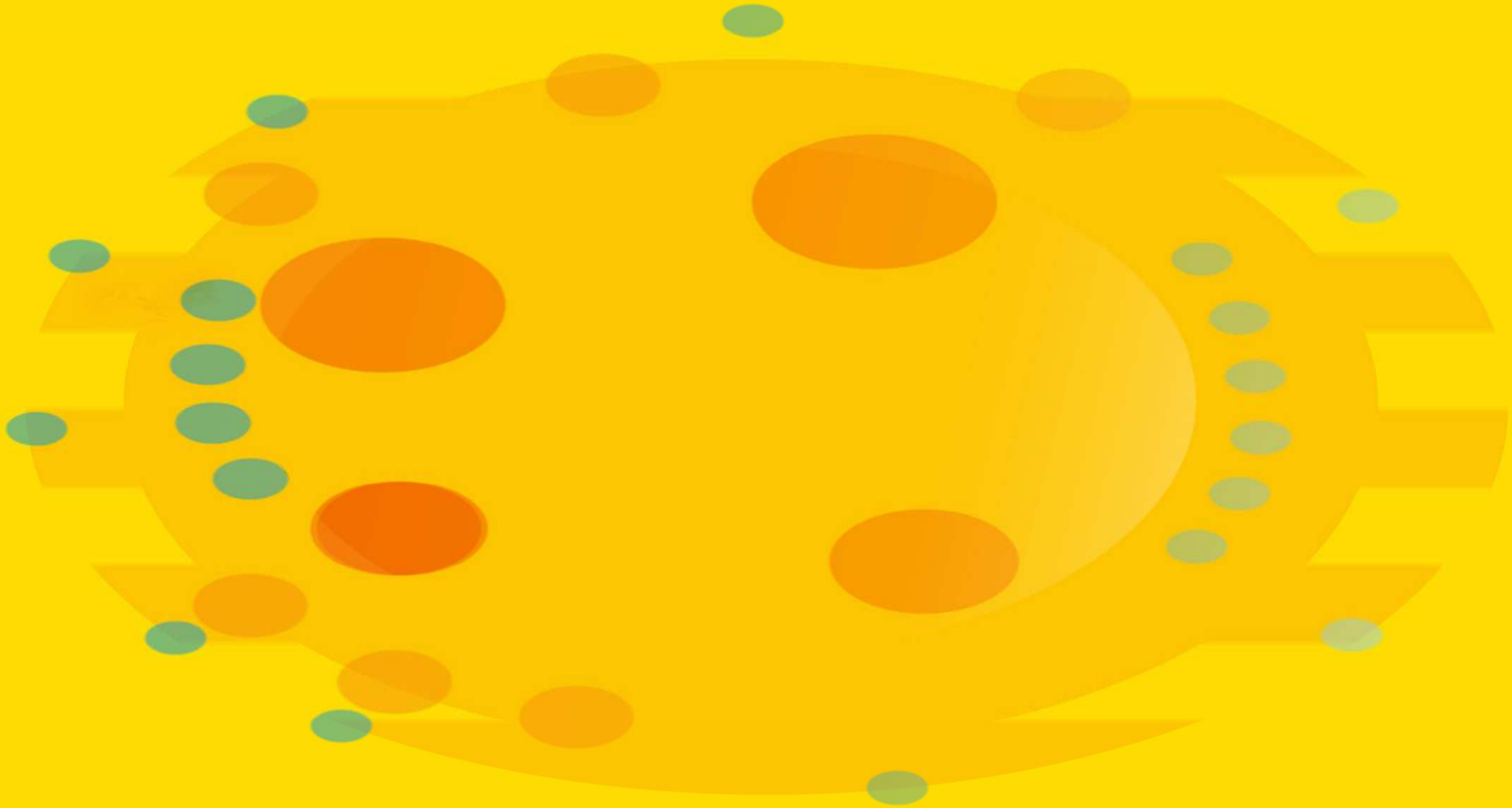

ইমরুল কায়েস

নির্বাচিত ছোটগল্প

ইমরুল কায়েস

প্রথম অন্তর্জাল সংস্করণ

৩ মাঘ ১৪১৬ ॥ ২০ জানুয়ারী ২০১০

প্রচ্ছদ

ইমরুল কায়েস

সূচিপত্র

বোয়াল	০৩- ০৮
মাজিদ মুনওয়ারের এক সকাল	০৯- ১৫
খাম	১৬- ১৮
প্রাকৃত	১৮- ২৩
সবুজ খাম	২৩- ২৭
আমার আত্মহনন বিষয়ক জটিলতা	২৮- ৩০

Seclected short stories of Imrul Kayes, a self e-book publication by Imrul kayes; first internet edition published on 20th january 2010.

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমি একবার মাছ ধরতে যাই। এটাকে অবশ্য মাছ ধরা না বলে মাছ দেখাও বলা যেতে পারে। আমার এক বন্ধু একবার বলেছিল জ্যোসনা রাতে করতোয়ার বোয়ালরা তীরের খুব কাছাকাছি চলে আসে । পানিতে তাকালে নাকি বোয়ালের জ্বলজ্বল করা রূপালী চোখ দেখা যায় । রূপালী চোখ নিয়ে বোয়ালরা যখন চারপাশে ঘুরে বেড়ায় তখন যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তার নাকি কোন তুলনা নাই । তাই বোয়ালের এই চোখ দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই আগষ্ট মাসের হাল্কা গরমের এক রাতে করতোয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

নজুপুর হাটের পাশেই এই করতোয়া নদী। হাটসংলগ্ন নদীর তীরটা ক্রমশ ভাঙছে। দোকানীদের হয়েছে অসুবিধা। কিছুদিন পরপরই দোকান সামনে এগিয়ে নিতে হয়, নদী এগিয়ে আসে। করতোয়ার অপর তীরে দীর্ঘ চর। চরের বালিতে আখ, চীনাবাদাম আর আলুর চাষ হয়। চর থেকে ওপারের গ্রাম্য হাটটা দেখতে ভালই লাগে। হাটের রাতে তীরসংলগ্ন দোকানগুলোর হ্যাজাক আর কুপির আলো দোকানের ফাঁকা ফাঁকা করে বসানো কাঠের চিরগুলোর মধ্য দিয়ে নদীতে এসে পড়ে। মনে হয় অজস্র জোনাকী যেন সার বেঁধে নদীর পানিতে এসে লম্বা লাইন দিয়েছে। আজও হাটবার ছিল। দেখতে দেখতে হাটটা ফাঁকা হয়ে গেল সন্ধ্যার পরপরই। গ্রামের হাট, বেশী রাত জাগার অভ্যাস নেই। হাট থেকে ফিরে আসা শেষ নৌকার লোকগুলোও চরের মধ্যে কিছুক্ষন বসে বিড়ি- সিগারেট খেয়ে ফিরে গেল। এই বিস্তীর্ণ চরে মানুষ বলতে গেলে এখন বোধহয় শুধু আমি আর রজব সরদার।

রজব সরদারের বয়স প্রায় পয়তাল্লিশের কাছাকাছি। খাটো, পাতলা টিঙটিঙে একজন লোক। এ বয়সে মাথার চুল কিছু পাকার কথা থাকলেও এনার চুল পাকে নি। রজবের বাড়ী এই করতোয়ার পাশেই কেবলাপুর গ্রামে। ঘরে জোয়ান ছেলেরা আছে। তারাই জমিজমা দেখাশুনা আর ক্ষেতখামারীর যাবতীয় কাজ করে। রজব সরদার মাছ ধরেন। মাছ ধরা তার পেশা নয় নেশা। যদিও রজবের কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায় কাজটা নিতান্তই শখের বশে হলেও বেশ মনযোগ দিয়েই পেশাদারিত্বের সাথে করেন তিনি। রজবের সাথে আমার প্রথম যখন এই অঞ্চলে এসে দেখা হয় তখন সে আমাকে বলেছিল, ‘বুঝলেন মাছ ধরাটা হইল গিয়া একটা বদ

নিশা, মদ আর মাইয়া মানুষের চাইয়াও খারাপ নিশা, সহজে ছাড়ান যায় না । যৈবনে যে একবার মাছ ধরে বুড়া বয়সে আইসাও তারে মাছ ধরতে হয়।'আমি রজবের কথা শুনে সে সময়ে হেসেছিলাম ।

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ের রাত। সারাদিনে গরম থাকলেও রাতের বেলা দেখি চরে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। উত্তরবঙ্গ, এখানে শীত বেশ তাড়াতাড়িই আসে। রজব আমাকে ফুলহাতা শার্টটার নিচে গেন্জিজাতীয় কিছু একটা পরে নিতে বলেন। আমি বলি,
'কোন গেন্জি তো আনি নি'।
রাতে এরকম শীত পড়বে কে জানত ? রজব বলেন,
'চিন্তা কইরেন না। চালা থেকে গিলাপ(চাদর) দিয়া দিমুনে।'

এই চরের মধ্যে রজবের চালা আছে জেনে আমি একটু আশ্চর্য হই। আরও আশ্চর্য হই চালার গঠনশৈলী দেখে। চালা ঘর বলতে যে রকম ঘর কল্পনায় চলে আসে সেরকম ঘর এটা নয়। কোন রকমে দুইজন মানুষ থাকার জন্য একটা কুঠুরিমতন জিনিস তৈরী করা হয়েছে আখের পাতা আর বাশের কঞ্চি দিয়ে। কয়েকটি কঞ্চি এক জায়গায় করে খুঁটির মত বানিয়ে উপরে আখের সরু পাতা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম দিন যখন রজবের সাথে এই চরে দেখা হয়েছিল তখন চালাটি চোখে পড়ে নি।

আমি রজবকে বলি,
'কি এখানে থাকেন নাকি?'
রজব বলেন, 'মাছ ধরন হইল গিয়া ধৈর্য্যের কাম। কতক্ষন আর ধৈর্য্য রাখা যায়। মাঝে মইদ্যে চালায় যাই, খানিকটা জিরায়া আসি। বাড়ী থাইকা আহনের সময় সাথে মশারী নিয়া আহি। মশার যন্ত্রনা আছে। চারপাশে টাঙায়া দেই । ইচ্ছে হইলে তাই ঘুমোনও যায়।'
রজব আমাকে চালার মধ্য থেকে চাদর বের করে দেন। চালার মধ্যে রজবের মাছ ধরার সামগ্রী আর কিছু শুকনা খাবারও দেখি। আমার আর তর সয় না, বলি,
'চলেন, মাছ ধরার আয়োজন শুরু করি।'

যদিও আমার উদ্দেশ্য মাছ ধরা নয় মাছ দেখা তারপরও রজবকে মাছ ধরার কথাই বলতে হয়। এই নিশুতি রাতে কেউ একজন মাছের চোখ দেখার জন্য এই চরে পড়ে আছে এটা শুনলে রজব নিশ্চয় আমাকে পাগল ভাববে। রজব অনিকক্ষন কাশেন। চরের ঠান্ডা হাওয়ায় দিনের পর দিন থেকে হয়ত কাশি লাগিয়ে ফেলেছেন।

কাশি থামানোর পর বলেন,
'চ্যাং দিলেও এহন কাম হইব না। মাছেরা মানুষের চাইতে রাত ভাল বোঝে, বেশী রাত না হইলে তীরের কাছে আহে না।'

চ্যাং শব্দটা আগে কোনদিন শুনেছি বলে আমি মনে করতে পারি না। রজবের কাছে জানতে চাই এই চ্যাংটা কি ? রজব বলেন, 'চ্যাং হইল গিয়া গড়াই মাছেরই একটা জাত। তয় এরা বেশী অস্থির। বরশীতে গাঁইথা পানিতে ছাইড়া দিলে খালি লাফায়। এদের বোয়াল কামুড় দিলেই বোয়াল শ্যাষ, বরশী ঢুইকা যায় বোয়ালের মুখের মইদ্যে।'

রজব চালাঘর থেকে চটের একটা বস্তা এনে চরের হাল্কা ভেজা বালিতে পেড়ে দেন। আমি বসি। রজব হুকায় টান দিতে থাকেন। এই দিনেও লোকজন হুকা খায় এটা আমার জানা ছিল না। আমি তন্ময় হয়ে রজবের হুকা খাওয়া দেখি। রজব গল্প জুড়ে দেন, নিতান্ত পারিবারিক গল্প।

রাত গভীর হয়ে গেল রজব পলিথিনের একটা প্যাকেট থেকে চ্যাং বের করা শুরু করেন। প্যাকেটের পানিতে দেখি এরা ভালভাবেই বেঁচে আছে। রজবের কথাই ঠিক, এই মাছ অতিশয় অস্থির। হাতে নেয়ার সাথে সাথে মাথা ও লেজ একসাথে প্রবলবেগে নাড়াতে শুরু করে। রজব একটা একটা করে চ্যাং বরশীতে গাঁথেন। শরীরের মাঝামাঝি বরশী গাঁথার ফলে চ্যাং আরও বেশী করে লাফাতে শুরু করে। বরশীর সূতাটার আরেক মাথা বাঁধা হয় শক্ত বাশের কঞ্চির সাথে, নদীর পাড়গুলোতে এগুলো নাকি পোতা হবে। আমি আর রজব দুজনে মিলে সবগুলো কঞ্চিগুলো কিছুদূর ফাঁক ফাঁক করে করে তীরে গেড়ে আসি।

আমরা চালার সামনে এসে বসে পড়ি । রজব আবার বলতে শুরু করেন,
‘বুঝলেন তো মাছ ধরা হইল গিয়া ধৈর্য্যের কাম. . . . . ।’

হ্যাঁ, মাছ ধরা যে আসলেই চরম ধৈর্য্যের একটা কাজ সেই রাতে সেটা বুঝতে পারলাম হাড়ে হাড়ে। অনেকক্ষন আগে চ্যাং সমেত বরশী দেয়া হলেও সেগুলোতে কোন মাছ পড়ে না। আমি মাঝে মাঝে পানির কাছাকাছি গিয়ে টর্চ মেরে দেখি, বোয়ালের চোখ খুঁজি। রজব হয়ত মনে করেন মাছ পড়ছে না দেখে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি । আমাকে বলেন,
‘ঘুরনের কাম নাই আপনের, এইহানে আইসা বসেন । বোয়াল পড়লে এমনিতে বুঝবেন, পানির মইদ্যে চ্যাংয়ের ছঠফটানি যাইব বাইড়া। বোয়াল আইসা চ্যাংরে একেকটা কামড়াইব আর চ্যাংও এদিক ওদিক লাফাইব।‘

হ্যাঁ, চ্যাংকে ঘায়েল করতে বোয়ালের বোধহয় ভালই সময় লাগে কারন পানিতে একসময় বেশ হুটোপুটির শব্দ শোনা যায়। নিস্তব্ধ করতোয়ার পাড়ে শব্দটা ঠিক যেন বর্শার ফলার মতই বেঁধে কানে। রজব বলেন,
‘চলেন একটা বুঝি পড়ল ।’আমি আর রজব তড়িঘড়ি করে যাই শব্দটার উৎসের কাছে।‘

গিয়ে দেখি কঞ্চিটা ঠিকই চরের বালিতে গাড়া আছে, বরশীও ঠিক আছে কিন্তু বরশীতে গাঁথা মাছটা আর নেই। আমি রজবকে আমার বামে একটু দূরে পানিতে রূপালী রংয়ের একটা চোখ দেখাই। রজব বলেন, ‘ওঠেন, তাড়াতাড়ি টর্চটা ফেলেন ঐদিকে।’

আমি আমার সাথে থাকা এক ব্যাটারীর টর্চের আলো নদীর পানিতে ফেলি। পানির মধ্যে রূপালী চোখ নিয়ে একটা বোয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রজব অনেকক্ষন কেশে নেন তারপর বলেন, ‘এই বোয়ালটা অনেক বড়, গতবার পাইছিলাম এইরকম একটা। সচরাচর এইরকম বড় বোয়াল পাওয়া যায় না ।‘
আমি বলি, ’কোথায় আমার কাছে তো খুব একটা বড় মনে হল না।’রজব বলেন, ‘আপনারা সাহেব- সুবা শহরের মানুষ, পানির উপরে থাইকা কি আর বোয়ালরে বুঝতে পারবেন।’এতবড় একটা বোয়াল হাতছাড়া হওয়ায় রজবের মন একটু খারাপই হওয়ার কথা কিন্তু তাকে দেখে সেরকম মনে হল না ।‘
তিনি বলে চললেন, ’বুঝলেন যত বড় মাছ তত চালাক । চালাক না হইলে কি আর পানির এত শত্রুর মইদ্যে বাইড়া ওঠন সম্ভব । দেখলেন না চ্যাংটারে কেমনে খাইয়া গেছে । বরশী তো আমরা দিছিলাম চ্যাংয়ের পেটের মইদ্যে । এইটা কামুড় দিছে ল্যাজে । যাই হোক একবার যহন খাইছে তখন এইটা এহানেই থাকব । আসেন আমরা আরেকটা চ্যাং দেই।‘

রজব আগের মতই পলিথিনের প্যাকেটটা থেকে আরেকটা চ্যাং এনে বরশীতে গেঁথে দেন। আমরা চালার সামনে গিয়ে আবার বসে পড়ি।

খানিকক্ষণ পর আবার হুটোপুটির শব্দ শুরু হয় পানিতে। আগের জায়গাটা থেকেই শব্দটা আসছে। আমরা আবার প্রবল আগ্রহ নিয়ে কঞ্চিটার কাছে যাই ও হতাশ হই। চ্যাংটা নেই। হয়ত আগের বোয়ালটাই মাছটা খেয়ে গেছে অথবা নতুন কোন বোয়াল এসেছিল।

রজব আমাকে বলেন, ’বুঝলেন আগের বোয়ালটাই চ্যাং টা খাইয়া গ্যাছে। এত জলদি জলদি আরেকটা পড়নের কথা না।‘

রজব আরেকটা মাছ বরশীতে গেঁথে দেন এবং আগের মতই আমরা আবার চালার সামনে এসে বসি। আবার কিছুক্ষণ পর বরশীতে বোয়াল পাওয়ার শব্দ পাই কিন্তু কোন বোয়াল আর পাওয়া যায় না। রজবের এই একটা বরশীতেই আরো দুটা চ্যাং নষ্ট হয়, একটাতেও পড়ে না বোয়াল। রজব বিড়বিড় করে কি যেন বলেন। হয়ত মেজাজ খারাপ হয়েছে তার। আমার বেশ মজাই লাগে। আগেই বলেছি মাছ ধরার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই রাতে করোতোয়ার পাড়ে আমি আসি নি এসেছি জ্যোসনা রাতে বোয়ালের রূপালী চোখ দেখতে। সে আশা আমার প্রথমবারেই পূর্ণ হয়েছে। সে এক দৃশ্য বটে! বন্ধুটা আমার ঠিকই বলেছিল। গোটা দুনিয়ায় এরকম সুন্দর দৃশ্য খুব একটা নেই।

রজব বলেন, ’’বুঝলেন তো এইভাবে হইব না, পঁচা লাগব ।‘
রজব লোকটার এই এক মুদ্রাদোষ কথায় কথায় বলেন বুঝলেন । পঁচা জিনিসটা কি আমার মাথায় ঢোকে না । আমি বলি, ‘পঁচা কি?’ রজব বলেন, ‘পঁচাই হইল আসল ধৈর্য্যের খেলা । আসেন আপনেরে দেখাই।‘
রজব চালাঘর থেকে আরেকটা প্লাষ্টিকের প্যাকেট খোলেন। প্যাকেটের ভিতরে বেশ কটু গন্ধযুক্ত রোদে শুকানো পুঁটি মাছ। মাছগুলোর ভিতরের পুরো কাঁটাই বেশ দক্ষতার সাথে তুলে ফেলা হয়েছে। রজব একটা মাছ নিয়ে কাঁটার ফাঁকা জায়গাটায় একটা বরশী বিঁধে দেন। যে জায়গাটায় বোয়ালটা বারবার চ্যাং মাছগুলো খেয়ে যাচ্ছিল তার পাশেই নদীর পানিতে সামান্য দূরে বরশীটা ছুড়ে দিয়ে চরের মাটিতে বসে পড়েন। আমাকে বলেন, ‘বসেন । এইবার হইল গিয়া আসল খেলা। পঁচাটা দিলাম পানির মইদ্যে, এহন বইসা থাকনের পালা। ফকফকা জোসনারা রাইত, খালি বইসা থাকবেন

আর খিয়াল করবেন বরশীটার দিকে। পঁচার পুঁটিটা যখন বোয়ালে খাইব তখন বরশীর সূতাটা সইরা যাইতে থাকব একদিকে। বাস, যেইদিকে সূতাটা সইরা যাইব তার উল্টাদিকে দিবেন জোরসে একটা টান। বোয়ালের গলায় আটকাইয়া যাইব কাঁটাটা।'

রজবের কথায় আমি আশ্চর্য না হয়ে পারি না । এত মনযোগ দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কিভাবে পঁচার দিকে তাকিয়ে থাকা সম্ভব? রজব আবার বলেন, 'এইজন্যি তো আপনেরে বারেবারে কই বড়ই ধৈর্য্যের কাম এইটা । এইযে বসছেন একবার পঁচা দিয়া, সারারাত বইসা থাকলেও যে মাছের নাগাল পাবেন তার কি কোন ঠিক আছে?'

রজব বসে থাকেন। বসে থাকতে থাকতে পা লেগে গেলে একসময় আমাকে পঁচাটা দেন। 'ধরেন, এট্টু তামুক খাইয়া আহি।'
আমি পঁচাটা ধরে বসে থাকি আর মাছের চোখ দেখার জন্য এদিক-ওদিক তাকাই। কিছুক্ষণ পরেই রজব আবার ফিরে এসে আবার পঁচাটা ধরেন। আমি নদীর ধারে এদিক- ওদিক হাটি, সিগারেট খাই, চালাঘরে শুয়ে থাকি । মাছ আর পঁচায় পড়ে না। দু- একবার রজবের কাছে যাই এখানেও নাকি বোয়াল টোপ খেয়ে যাচ্ছে ।
রজব বলেন, 'বুঝলেন বড়ই কাউটা মাছরে ভাই এইটা, ক্যামনে ক্যামনে জানি পঁচা খাইয়া যাইতাছে।'
আমি বলি, 'কিভাবে বুঝলেন এটা আগের বোয়ালটাই, অন্য বোয়ালও তো হতে পারে।'
রজব খানিকটা ক্ষেপে যান।

'বিশ বছর ধইরা মাছ ধরতেছি। মাছেরে ভালই চিনি। তয় এরে ছাড়তেছি না আজকে । আপনে যান চালায় শুইয়া পড়েন।'

আমি চালাঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি। মশারীর ফাঁক দিয়ে চরের হাল্কা ঠান্ডা বাতাস ভেঙে ভেঙে ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। ঘুমানোর জন্য আদর্শ আবহাওয়া। ঘুমানোর ইচ্ছা না থাকলেও তাই একসময় ঘুমিয়েই পড়ি।

ঘুম ভাঙে প্রায় শেষ রাতের দিকে, রজবের গজগজানিতে । 'বুঝলেন এতদিন ধইরা মাছ ধরি এইরকম চালাক মাছ আর দেখিনি। চ্যাং- পঁচা কিছুই মানতেছে না । চলেন এইবার শেষ চেষ্টাটা করি, কাটাটা মারি।'

চালাঘরে আমি যেখানে শুয়েছিলাম তার নিচ থেকে পাতলা লোহার তৈরী শাবল জাতীয় একটা জিনিস বের করেন রজব। জিনিসটার মাথায় শাবলের মতই তীক্ষ্ণ ফলা। এটাই নাকি কাটা। রজব পলিথিনের ব্যাগ থেকে শেষ চ্যাংটা বের করেন। আগের মতই চ্যাংটা বরশীতে গেঁথে বরশীর সূতা কঞ্চিতে বেঁধে আগের জায়গাটাতেই পুতে ফেলেন।

রজব বলেন, 'বুঝলেন শ্যাষবারের খেলা এইবার। বোয়ালের চ্যাংটারে ধরার আওয়াজ পাইলেই টর্চ মারবেন ঐ জায়গায় । এরপরে আমি আছি।'

আমরা আবার চরের মাটিতে বসে জলের শব্দ শুনতে থাকি। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও যখন কোন বোয়াল আসে না তখন আমার মেজাজ সত্যিই খারাপ হতে থাকে, মাছ ধরাতো আমার কাজ নয় !
আমি রজবকে বলি, ‘চলেন আজকে আর মনে হয় হবে না। ঐ বোয়ালটাই যে আসবে তার কি গ্যারান্টি ?’

রজব আমার কথার কোন জবাব দেন না। মনে হয় বিরক্ত হয়েছেন আমার ওপর। তবে মাছটার উপর তার ক্ষোভ কোন পর্যায়ে এসে পড়েছে তা বুঝতে পারি। আমি এবার রজবের সামনেই একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে পড়ি। রজব বলেন, ’সারারাইত তো থাকলেনই, এই শ্যাষবার একটু দেহেন।’

রজবের কথা মিথ্যা হয় নি। ফজরের আজানের ঠিক একটু আগে পানিতে চ্যাংয়ের লাফালাফি প্রবল হয়ে ওঠে। বোয়ালের রূপালী চোখটা আবার আমি দেখতে পাই। রজব মুখে আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে বলেন আর ইশারায় আলো ফেলতে বলেন। আমি পানিতে মাছটার উপর আলো ফেলি। আলো ফেলামাত্র রজব কাটাটা নিয়ে বিদুৎবেগে মাছটার শরীরে বিদ্ধ করার জন্য পানিতে লাফ দেন। বয়স্ক একজন লোক কিভাবে এত তাড়াতাড়ি কাটাটা সমেত পানিতে লাফিয়ে পড়ে কাটাটা মাছের গায়ে বিদ্ধ করার চেষ্টা করেন তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। হয়ত টর্চের আলোয় মাছ দূরে সরে যেতে চায়। এত তাড়াতাড়ি না করলে চলবে কিভাবে? রজবের শেষ চেষ্টাটা বিফলে যায় নি। বেশ বড় সাইজের কাটাবিদ্ধ একটা বোয়াল নিয়ে রজব উঠে আসেন পানি থেকে। কাটাটা দেখি বোয়ালের শরীরের ঠিক মাছখানে বিঁধেছে। থেতলে গেছে বেশ খানিকটা অংশ।

রজবের মুখে বিজয়ীর হাসি।
‘কইছিলাম না আগের বোয়ালটাই, দেখছেন কত্ত বড়। আগের বছরে যেইটা পাইছিলাম তার চাইতে এটা বড়। বুঝলেন এইজন্যি কাটা দিয়া মাছ ধরি না, মাছের শইল বলতে কিছু থাকে না।‘

আমি মাছটার দিকে তাকিয়ে থাকি । জলের মধ্যে জীবন্ত মাছের চোখ আর জলের বাহিরে মৃত মাছের চোখের মধ্যে কত পার্থক্য।
রজব বলেন, ‘আপনেরে কিন্তু আজকে আর সহজে ছাড়তেছি না। সকালে বাড়িত থাইকা মাছের পেটি দিয়া ভাত খাইয়া যাবেন।‘

আমি কিছু বলি না। এরকম লড়াকু, পরাজিত আর অবশেষে মৃত বোয়ালটা দেখতে আমার কেন জানি ভাল লাগে না।

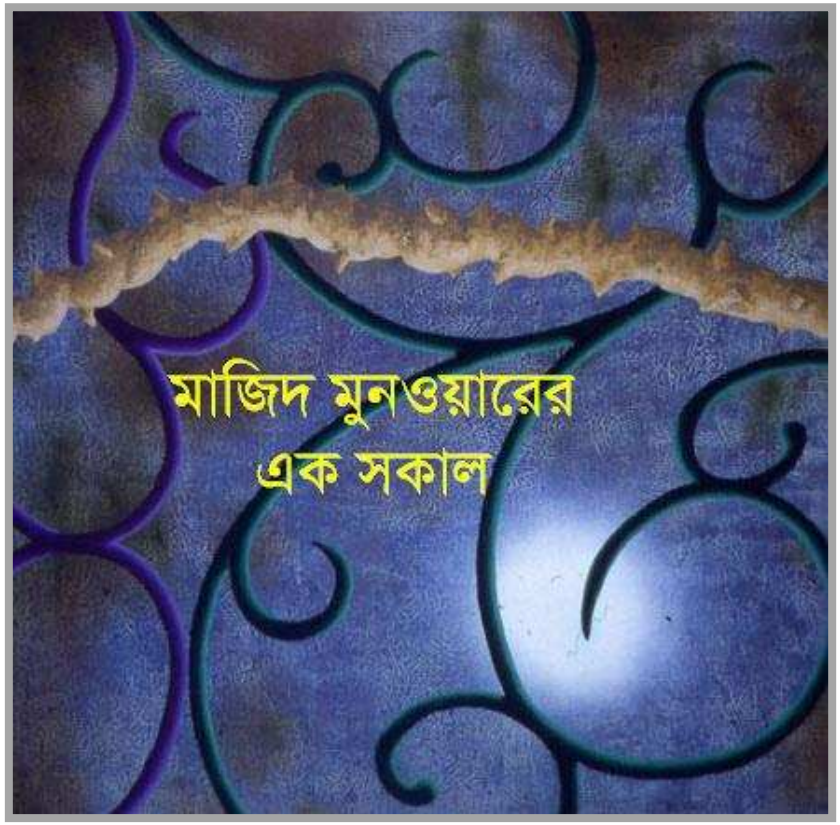

মাজিদ মুনওয়ার ঘুম থেকে উঠলেন সকাল সাড়ে ছয়টায়। গরমের দিন । বেশ সকালই হয়েছে। তার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। ফজরের নামাজটা কাজা হয়ে গেছে এটা না যত বড় কারন তার চেয়ে বড় হল কারন আজকের বয়ানের পয়েন্টগুলো ভোরে লেখা হল না এটা। মফস্বল শহরে একটা মাহফিলে সন্ধ্যার পর বয়ান দেওয়ার কথা তার। মফস্বলের মাহফিল। স্বাভাবিকভাবে অনেক লোকজনই হবে। তার বয়ানটাও তাই ভাল হওয়া দরকার। এই বয়ানে কি কি বিষয় নিয়ে বলবেন সেগুলোই পয়েন্ট আকারে লেখার কথা ফজরের নামাজের পর, এ সময় তার মাথা ভাল খোলে। অথচ তিনি উঠলেনই ভোর হওয়ার অনেক পরে, অসময়ে এখন আবার কাগজ কলম নিয়ে বসতে হবে।

মাজিদ মুনওয়ার বামপার্শ্বে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। ময়না এখনও ঘুমিয়ে আছে। বিয়ের এতদিন পরেও ভোরে না ডেকে দিলে সে ফজরের নামাজ ধরতে পারে না। এত ঘুম ময়নার! ঘুমায়ও তো ঠিক দশটায়। সারাদিন কি এমন কাজটাই করে সে? কাজ বলতে তো সেই সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত মহিলা মাদ্রাসার মাষ্টারি। বাসায় কাজ করার জন্য দুটো চাকর। বাসার কোন কাজও তাকে করতে হয় না। অথচ তার ঘুম দেখলে মনে হয় দুনিয়ার সব কাজ একা করে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাজিদ মুনওয়ার ময়নাকে ধাক্কা দেন। ‘এই ওঠ ‘। ময়না চোখ ঘষতে ঘষতে উঠে বসে। মাজিদ মুনওয়ার ধমকের সূরে বলেন, ’একদিনও তো আমারে জাগায়ে দিতে পারলা না, ফজরটা কাজা হয়ে গেল' ।ময়নাও পাল্টা ধমকের সূরে বলে, ’ভোরে উঠবেন কেমনে । সারারাত তো পার্টির কাজ করে আসেন ' ।

ময়নার কথা অবশ্য মিথ্যা না। কয়েকদিন হল পার্টি অফিসে গভীর রাত অবধি কাজ করতে হচ্ছে মাজিদ মুনওয়ারকে, কালকেই

অফিস থেকে বেড়িয়েছেন প্রায় সোয়া বারোটায়। দেশে যুদ্ধপরাধী নিয়ে ডামাডোল শুরু হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে পার্টির নেতৃস্থানীয় লোকজন খুব চিন্তিত। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা ক্ষমতায়, যে কোন কিছুই হওয়া সম্ভব। সামনে দিনে এই বিষয়টা আরো জট পাকিয়ে গেলে পার্টির কৌশলগত দিকগুলো কি কি হবে এগুলো নিয়েই আলোচনা চলছে তিন দিন ধরে। পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতারা থাকছেন, আলোচনা হচ্ছে, মাজিদ মুনওয়ারও সেখানে থাকছেন। মিটিং শেষ করে বেড়িয়ে পড়তে পড়তেই রাত বারোটা পেরিয়ে যাচ্ছে।

সকাল আটটায় ময়না মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে যাওয়ার পর মাজিদ মুনওয়ার যখন তার লাল কভারের বয়ানের খাতাটায় লেখা শুরু করবেন বলে ভাবছেন তখন তার মোবাইল ফোনে একটা কল আসে।

- আসসালামুআলাইকুম।
- ওয়ালাইকুম সালাম।
- মাজেদ ভাই কইতায়াছেন।

মাজিদ মুনওয়ারে ভ্রু কুঁচকে যায়। তিনি শান্ত গলায় ‘রং নাম্বার ‘কথাটা বলে কলটা কেটে দেন। মোবাইল ফোনের অচেনা নাম্বারটির দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারেন কলটা তার কোন আত্নীয়ের কাছ থেকেই সম্ভবত হবে। মাজেদ মনোয়ার থেকে মাজিদ মুনওয়ার হয়েছেন তিনি বেশ আগেই। একজন ইসলামিক স্কলারের নাম মাজেদ, মনোয়ার এইসব হবে এটা কেমন কথা? পিতৃপ্রদত্ত নামটা তিনি তাই পাল্টে দিয়েছিলেন অনেক আগে, তফসীরে কোরআন হওয়ার পরপরই। এলাকার অল্প কিছু লোকজন আর নিকট আত্নীয়রা ছাড়া দেশের সব লোক আজ তাকে মাজিদ মুনওয়ার নামেই জানে। তাই, তাকে মাজেদ বলে সম্বোধন করা মোবাইল ফোনের এ নাম্বারটা যে তার গ্রামের কোন আত্নীয়ের এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ থাকে না। আত্নীয়-স্বজনদের মধ্যে অধিকাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়। এরা নানান সময়ে মাজিদ মুনওয়ারকে ফোন করে যন্ত্রনা করে, টাকা পয়সা সাহায্য চায়। যেন তিনি দুনিয়ার সব টাকা-পয়সা হাতে নিয়ে সাহায্য করার জন্য বসে আছেন। মেজাজাটাই খারাপ হয়ে যায়। মাজেদ সম্বোধন করে আসা ফোন ইদানিং তাই তিনি আর সেরকম ধরছেন না।

মাজিদ মুনওয়ার আবার লিখতে বসেন। বয়ানের পয়েন্টগুলোতে যাওয়ার আগে তিনি খাতায় দুটি তারকা চিহ্ন দেন। ইদানিং ছোটখাট বিষয়গুলো তার মনে থাকছে না, সবই তাই নোট হিসেবে লিখে রাখতে হচ্ছে। প্রথম তারকার পাশে তিনি লেখেন " দলকে বেশি করে প্রমোট করতে হবে "। গত কয়েকদিনের পার্টির সভাতে এই কথাটা বার বার করে এসেছে। যুদ্ধপরাধী বিষয়ক ডামাডোলের মধ্যে দলের পজেটিভ প্রচারটা ফলাও করে করতে হবে। তারা যে আল্লাহর দল করছেন, তাঁর পন্থা বাস্তবায়নের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, এটা সর্বসাধারণের মধ্যে আরো বেশি করে ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য পার্টির যে সমস্থ ইসলামিক স্কলাররা বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান করেন তারা যেন বেশি করে ঐ সব বয়ানে পার্টিকে প্রমোট করেন, এটাই পার্টি থেকে তাদের উপর নির্দেশ। মাজিদ মুনওয়ার "দলকে বেশি করে প্রমোট

করতে হবে " কথাটার উপর আরেকবার কলম ঘোরান, বোল্ড করা বাক্য তাড়াতাটাড়ি চোখে পড়বে হয়ত এ ভেবেই। এরপর দুই নম্বর তারকার পাশে দ্বিতীয় পয়েন্টটা লেখেন। তিনি লেখেন, " আঞ্চলিকতার টান পরিহার করতে হবে "। আঞ্চলিকতার সমস্যাটা তার যাচ্ছেই না, বয়ানের সময় আঞ্চলিক শব্দ বা টান কথার মধ্যে এসে যাচ্ছে। এই যেমন গত সপ্তাহেই একটা বয়ানে দেশের দুই নেত্রীর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন " আল্লাহ এই দুই বেডীরে হেদায়েত করুন"। মাহফিলে অনেক আধা নাস্তিক শিক্ষিত লোকও আসে। বয়ানের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললে, কথার মধ্যে আঞ্চলিকতার টান থাকলে তারা ভাববেটা কি? তাদের কাছে তিনি তাহলে পৌছাবেনই বা কিভাবে? তাকে তাই এই বিষয়টাও বেশ ভাল করে খেয়াল করতে হচ্ছে।

পয়েন্ট দুটো লেখার পর মাজিদ মুনওয়ার হাজেরাকে চা দিতে বলেন। হাজেরা এ বাসায় কাজ করে। হাজেরাটা বড় হচ্ছে। ফ্রকের মধ্য দিয়ে শরীরটা প্রায় ফুঁড়ে বের হয়ে আসে । ওদিকে তাকালেই সে ফ্রকটা ঠিকঠাক করে নেয়। মাজিদ মুনওয়ার বুঝতে পারেন বয়স কম হলে কি হবে তার এ দৃষ্টি ঠিকই সে ধরতে পারে। তিনি এও বুঝতে পারেন এই মেয়ে আর বেশিদিন এ বাসায় থাকতে পারবে না। এই মেয়েগুলোর এই এক সমস্যা। ইসলামে দাস- দাঁসির উপর মালিকের যে একটা বৈধ হক আছে হাজারবার নসীহত করার পরও এরা সেটা বুঝতে পারে না। শরীরে দু- একবার হাত দিলেই কেটে পড়ে। সিদ্দিকটা ছিল বলে রক্ষা। একটা চলে গেলে কোত্থেকে কোত্থেকে জানি সে আরেকটা কম বয়স্ক মেয়ে ধরে আনে। অবশ্য করবেনা কেন? তিনি তো তার জন্য কম করেন নি?

হাজেরা চা দিয়ে গেলে মাজিদ মুনওয়ার দারুচিনি আর আদা দেয়া চা টায় চুমুক দিতে দিতে লিখতে থাকেন। গত কয়েকটা মাহফিলে কয়েকটা বড় সূরা তেলাওয়াতের পর তিনি'মুসলমানদের জমিন 'কথাটার প্রচার দিয়ে বয়ান শুরু করছেন। এবারও তিনি এটা করবেন। তবে এবার শ্রোতাদের সাথে ইন্টারাকশানটা আরো বাড়াতে হবে। এবার শুরুই করতে হবে একটা প্রশ্ন দিয়ে। শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন করবেন 'বাংলার এ জমিন কার, খ্রিষ্টানদের? ' । গুটিকয় লোক ছাড়া প্রায় সবাই নিরুত্তর থাকবে। সব মাহফিলেই এরকমটা হয়, শ্রোতারা প্রথমে নিরুত্তর থাকে, এদের জাগিয়ে তুলতে হয়। তিনি বলবেন, 'কি? কথা বলেন না কেন? বলেন এ জমিন কি খ্রিষ্টানদের?' । শ্রোতারা তখন সমস্বরে বলবে 'না ' । এরপর তিনি পরপর আরো এরকম কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। 'বাংলার এ জমিন কি ইহুদিদের? নাসারাদের? বিধর্মী- নাস্তিকদের? ' । সবাই প্রতিবার সমস্বরে 'না 'বলার পর তিনি বলবেন, 'তাহলে এবার বলেন এ জমি আসলে কাদের? বলেন কাদের ? মুসলমানদের, জোরে বলেন মুসলমানদের' । শ্রোতাদের কাছ থেকে মুসলমানদের নামটা তিনি আরো কয়েকবার শুনবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না চারদিকে 'মুসলমান 'শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এরপর তিনি গলার স্বর দ্বিগুন বাড়িয়ে বলবেন, 'হ্যাঁ, এ জমিন মুসলমানের, বাংলার এ জমিন হাজী শরীয়তউল্লাহ, শাহজালাল, শাহ মখদুম, ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজী আর নজরুলদের- রবীন্দ্রনাথদের নয় ' । এরপর রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলকে নিয়ে তিনি কয়েকটা তুলনামূলক কথা বলবেন। প্রতিটি মাহফিলেই তিনি এগুলো বলেন, মুখস্ত আছে। এটা অনেকটা এরকম, 'হ্যাঁ, নজরুলের জমিন রবীন্দ্রনাথের নয়। কাজী

নজরুল ইসলাম যখন বাংলা থেকে ব্রিটিশদের তাড়াতে কবিতা লিখছিলেন আর সেজন্য জেল খাটছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ কি লিখছিলেন জানেন ? জানেন তিনি কি লিখছিলেন? ' । শ্রোতারা নিরুত্তর থাকবে। তখন তিনি ব্যঙ্গোক্তির সূরে গাইবেন, 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ' । গানের ব্যঙ্গাত্মকতার খাতিরেই হোক অথবা বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝেই হোক লোকজন হেসে ফেলবে। এটারও দরকার আছে। রসকষহীন বয়ান মাজিদ মুনওয়ার পছন্দ করেন না। কিন্তু লোকজনের এই হাসি মাটিতে ফেলতে দেয়া যাবে না। হাসির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগে গলায় একটা প্রকট গর্জন তুলে বলতে হবে, 'কি বেয়াদাতি, নাফরমানি কাজকারবার, একমাত্র আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করা শিরক ' । মাজিদ মুনওয়ারের এই গর্জন শুনে শ্রোতাদের হাসিমুখ শক্ত হয়ে যাবে। তাদের এই শক্ত মুখের উপরেই ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারটা আটকিয়ে দিতে হবে।

মুসলমানের জমিন যে ইসলামের শিক্ষা ছাড়া চলতে পারে না, চলা উচিতও নয়, এ বিষয়টা তাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যে কি বেহাল অবস্থা চলছে এটা বুঝানোর জন্য মাজিদ মুনওয়ার কয়েকটা ছড়ার আশ্রয় নেন। গত সপ্তাহের মাহফিলে তিনি বলেছেন 'হট্টিমাটিমটিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাদের খাঁড়া দুটি শিং'ছড়াটার কথা, আজকের মাহফিলটায় বলবেন 'আগডুম বাগডুম 'ছড়াটার কথা। মাজিদ মুনওয়ার এই ছড়াগুলো মাহফিলে আবৃতির ঢংয়ে পড়ার সময় কিছুটা বিব্রত বোধ করেন কারন এজন্য তাকে কিছু নির্জলা মিথ্যা বলতে হয়, গল্প বানাতে হয় ছোট মেয়েটাকে নিয়ে। তিনি ঠিক করেন এবার বলবেন এরকম করে, 'এই দেশে ইসলামের শিক্ষাকে পাঠ্য করা হয় নি, যা পাঠ্য করা হয়েছে তার থেকে আমরা শিখেছি? কি শিখেছি আপনারা শুনবেন?' । তিনি মুখটা কৌতুকময় করে শ্রোতাদের দিকে এমনভাবে তাকাবেন যে, তারা আসন্ন কৌতুকের সম্ভাবনায় আহলাদিত হয়ে মুখ গোল করে বলবে 'শুনব' । তখন তিনি বলবেন, 'আমার ছোট মেয়েটা কয়েকদিন আগে গেছে স্কুলে। সেখানে মাষ্টার কি শেখায় জানেন? শেখায় 'আগডুম ' । মেয়ে আমার আগডুম বোঝে না । সে স্যারের কাছে জানতে চায় স্যার আগডুম কি? স্যার তখন বলেন 'বাগডুম '। মেয়ে বাগডুমও বোঝে না। সে স্যারের কাছে আবার বাগডুম কি জানতে চায়। স্যার তখন বলেন, 'ঘোড়াডুম সাজে'। মেয়ে আগডুম- বাগডুম- ঘোড়াডুমের কিছুই না বুঝে বাসায় এসে আমাকে বলে, 'আব্বা স্কুলে স্যার কি শেখায় কিছুই বুঝতে পারি না । এখন ভাইয়েরা আপনারাই বলেন আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম এইসব কি? এইসবের কি বাস্তবে কোন অর্থ আছে। মানে একেবারে ছোট থেকেই আমরা মিথ্যা শিখে আসছি। এই হল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। অথচ কুরআন- হাদীসে বারবার এসেছে কৌতুক করে হলেও শিশুকে মিথ্যা বলা যাবে না। আল্লাহতায়ালা কোরআনে বলেছেন.....' । এখানে তিনি একটা বড়সড় আয়াত সূর করে তেলাওয়াত করবেন। মোফাচ্ছেরে কোরআন হয়েছেন বলে অনেকে মনে করে তিনি কোরআনের সব আয়াত আর তার বিশ্লেষণ মাথায় নিয়ে ঘোড়েন। অথচ বাস্তবতা হল কিছুদিন না দেখলেই তিনি অনেক আয়াতেরই কিছু অংশ ভুলে যান। এটা অবশ্য তেমন কোন সমস্যা না। বয়ানের প্রতিটা টপিকের উপর তার লেখা খাতা আছে। মাজিদ মুনওয়ার টেবিলের ড্রয়ারের অনেকগুলো খাতার মধ্য থেকে সাদা কভারের

একটা খাতা বের করেন। খাতাটার উপরে লাল মার্কার দিয়ে লেখা ‘শিক্ষাব্যবস্থা ' । এখানে তিনি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত আয়াতগুলো টুকে রেখেছেন। আয়াতগুলো থেকে উপযুক্ত কয়েকটা আয়াত বের করে তিনি নোট করে রাখেন। উপরে ডাবল কালিতে মোটা করে লেখা ‘দলকে বেশি করে প্রমোট করতে হবে ‘লেখাটা মাজিদ মুনওয়ারের চোখে পড়ে। তিনি ঠিক করেন বয়ানের এই পর্যায়েই দলকে প্রথমবারের মত প্রমোটের ব্যবস্থা করবেন, বলবেন, ’সুতরাং এই শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টানোর চেষ্টাটা কিছু লোক করছেন নাকি করছেন না ? কিছু লোক আল্লাহর রাস্তায় কাজ করে যাচ্ছেন কি না? একটি দল ইসলামের পথে আছে নাকি নাই ? আপনারা ইসলামের পথে আছেন নাকি নাই?’। আশা করা যায় এ প্রশ্নগুলোর উত্তর সবাই হ্যাঁ বাচকই দেবে এবং এর পরপরই তিনি বলবেন, ’তাহলে আপনারা সেই দলটার সাথে থাকতে রাজী আছেন তো? কারা কারা রাজী আছেন একটু হাতটা উপরে তুলে দেখান তো ' । লোকলজ্জার খাতিরেই হোক অথবা বয়ানকারীর চোখের রোষ আটকাতেই হোক প্রায় সবাই হাত তুলবে। তখন তিনি উচ্চস্বরে বলবেন, ’মাশাল্লাহ ' । এতবড় একটা মাহফিল থেকে দুই চার দশটা লোক যদি দলে না আসে তবে মাহফিল করেই বা লাভটা কি? মাজিদ মুনওয়ার যখন একথা ভাবছেন তখন দরজার কলিংবেলে আওয়াজ হয়।

হাজেরা এসে খবর দেয় স্থানীয় লোকজন নাকি এসেছে কিছু, তার সাথে দেখা করতে চায়। মাজিদ মুনওয়ার খুশি হন। মোহাম্মদপুরের এই বাড়িটা তিনি নতুন কিনেছেন। এলাকার লোকজনের সাথে আস্তে আস্তে ঘনিষ্টতা বাড়ছে। অবশ্য এই পরিচয়ের জন্য তাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হচ্ছে না। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সেই ইসলামিক স্কলার হিসেবে সমঝদারদের মধ্যে তিনি একটা জায়গা করে নিতে পেরেছেন। শহরের অনেক অডিও- ভিডিওর দোকানে তার বয়ানের ভিডিও বিক্রি হচ্ছে দেদারছে। কাঁটাবন মোড়ের কাফেলা ইসলামিক মাল্টিমিডিয়া সেন্টারের মালিক তো তাকে আগাম টাকাই দিয়ে রেখেছেন বয়ানের কপিরাইট হিসেবে। এছাড়া পার্টির টেলিভিশন চ্যানেলে নিয়মিত বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহন করছেন, শুক্রবার জুম্মার নামাজের পরের এক ঘন্টা তো তার ‘ইসলামিক সওয়াল ও জবাব ‘অনুষ্ঠানের জন্য বাঁধা। এসব অন এয়ারে যাচ্ছে নিয়মিত, কখনো কখনো পুনঃপ্রচারও হচ্ছে। সুতরাং একটা এলাকায় নতুন আসলে পরিচয়ের জন্য কষ্টটা তাকে করতে হবে কেন?

ড্রয়িংরুমে বসে থাকা ছেলেগুলোর দিকে তাকান মাজিদ মুনওয়ার। অধিকাংশের বয়স আঠারো থেকে চব্বিশের মত হবে। তিনি ধারনা করেন কোন পাবলিক প্রোগামে তাকে অতিথি করার জন্যই হয়ত এরা এসেছে। মাজিদ মুনওয়ারকে দেখে এরা সবাই দাড়িয়ে পড়ে ও হাল্কা স্বরে সালাম দেয়। তিনি তাদেরকে বসতে বলে তাদের আসার কারন জানতে চান। দলের মধ্যে যাকে দেখলে সবচেয়ে বড় মনে হয় সে বলে, ‘হুজুর, আমরা নববর্ষ উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করব পুলিশ ফাঁড়ির সামনের খেলার মাঠটাতে, চাঁদা চাইতে এসেছি সবার কাছে ' । ‘নববর্ষ ‘শব্দটা মাজিদ মুনওয়ারের কানের মধ্য দিয়ে ঢুকে ঠিক যেন কলিজায় গিয়ে আঘাত করে, শব্দটা শুনলেই তার আসমা খানের কথা মনে পড়ে।

বকশীবাজার আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ার সময় তিনি যখন নান্নুর হোটেলে বিকেলে সিংগারা-পুরী এসব খেতেন তখন ঠিক ঐ সময়টায় নিয়ম করে হাজী বিস্কুট এন্ড কোং এর স্বত্বাধিকারী মোফাজ্জল খান হাজীর মেয়ে আসমা খান হেঁটে যেত হোটেলের সামন দিয়ে। হয়ত প্রাইভেটেই পড়তে যেত। বিশ বছরের যুবক মাজিদ মুনওয়ার মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে জুল জুল করে আসমা খানকে দেখতেন। আসমা খানকে কখনো তার লাল কৃষ্ণচূড়া মনে হত, কখনো রজনীগন্ধা, কখনো বা লালপদ্ম। আসমার ফেরার পথেও তাই তিনি দাড়িয়ে থাকতেন নান্নুর হোটেলের সামনে। কিন্তু মাজিদ মুনওয়ারের এই লাল কৃষ্ণচূড়া ধরা হয় নি। সেবার পয়লা বৈশাখে বমনার বটমূলে আসমা খানকে তিনি দেখেছিলেন ছত্তিশ নম্বর বংশাল রোডের সাইকেল ব্যবসায়ী রমিজ সরকারের ছোট ছেলে রফিক সরকারের সাথে। পয়লা বৈশাখ অথবা নববর্ষ শব্দগুলো শুনলে তাই মাজিদ মুনওয়ারের মনটা খান খান হয়ে যায়, রমনার বটমূলে আসমা খানের রফিক সরকারের হাত ধরে ঘুরে বেড়ানো তার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। তার পুরো ক্ষোভটা অন্যায়ভাবে গিয়ে পড়ে নববর্ষের উপর, যেন সেবার নববর্ষের এই অনুষ্ঠানগুলো না থাকলে আসমা খানকে আপন করে পেতে তার কোন সমস্যাই হত না। মাজিদ মুনওয়ার ব্যক্তিগত ক্ষোভের পরিধি হতে নববর্ষকে কিছুতেই আলাদা করতে পারেন না। কে জানে এই ক্ষোভের কারনেই হয়ত তিনি নববর্ষের আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নববর্ষকে হিন্দুয়ানী অনুষ্ঠান বলে তুলোধুনো করেন। তিনি ভাবেন এই ছেলেগুলো এসে ভালই হয়েছে, সামনে যে একটা নববর্ষ আছে এটা তার স্মরণে ছিল না। নববর্ষর ব্যাপারটাও পয়েন্ট আকারে লিখতে হবে। মাজিদ মুনওয়ার তার ভাগের চাঁদার টাকাটা ছেলেদের দিয়ে দেন। এলাকার ছেলেপুলে, প্রথমেই এদেরকে বাঁধা দিয়ে ক্ষ্যাপানো ঠিক হবে না। কিছুদিন আগে হাত করতে হবে, পরে দু-একদিন ঝেড়ে বয়ান দিলেই এরা লাইনে আসবে। এরকম তিনি বহুত দেখেছেন। ছেলেগুলো টাকা নিয়ে চলে গেল।

মাজিদ মুনওয়ার আবার লিখতে বসলেন। তিনি পয়েন্ট করতে থাকলেন, বলবেন, ‘ভাইয়েরা আমার, সামনে নববর্ষ। ঢাকার ভদ্রলোকরা কি করবে জানেন ? সকালে এরা রমনার বটমূলে যাবে, যুবক-যুবতীরা ঢলাঢলি করবে, আর কিছু শিল্পী গলা ছেড়ে গাইবে ‘এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো.....’। এরা নাফরমান, নাদান। নববর্ষ একটা হিন্দুয়ানী অনুষ্ঠান। আল্লাহতায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এই প্রকৃতি। আমরা আল্লাহর গোলাম আর প্রকৃতি আমাদের গোলাম। বৈশাখ আসবে বলে তাকে ফুল-ফল আর পান্তাভাত দিয়ে আরাধনা, তাকে বরণ করে নেয়ার জন্য সমস্থ অনুষ্ঠাননাদি সবই ইসলাম ধর্মের বিরোধী। এসবই এসেছে হিন্দুদের পূজা-অর্চনা থেকে। আমাদের পবিত্র ধর্মে এসবের কোন স্থান নাই। যদি কেউ এসবের মধ্যে থাকে তবে সে পরকালে কঠোর শাস্তির ভাগীদার হবে ' । কথাগুলো তিনি বলবেন যতটা না জোরে তার চেয়েও জোরে বলবেন, ’সুতরাং আপনারা এবার নববর্ষের কোন অনুষ্ঠানে কেউ যাবেন?' । সবাই সমস্বরে ‘না ‘বললে তিনি বলবেন, ’আলহামদুলিল্লাহ ‘।

মাজিদ মুনওয়ার তার ড্রয়ারের খাতাগুলোর মধ্য থেকে আরেকটা খাতা বের করেন। এটাতে মোটা লাল মার্কারে ‘ইংরেজী ‘কথাটা

লেখা আছে। ইদানিং তিনি মাহফিলে দু- চারটা ইংরেজী বাক্যও বলছেন, মানে যতটা সম্ভব বলতে চেষ্টা করছেন। যারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, হুজুর দেখলেই নাক সিটকায়, মাহফিলের আশেপাশে থাকলে এরা বুঝুক। বুঝুক তিনি হেজিপেজি বা ফেলনা লোক নন, দুচার লাইন ইংরেজীর বিদ্যাও তার পেটে আছে। অবশ্য ইংরেজীগুলো শিখতে তাকে একটু কষ্টই করতে হচ্ছে। তার এক পুরনো বন্ধুকে বাংলা লিখে দিয়ে সেগুলোর ইংরেজী তরজমা তিনি লিখে নিয়েছেন এই খাতাটায়। ঘুরে ফিরে প্রতিটা মাহফিলেই এগুলোর কয়েকটা করে বলেন। অবশ্য এই ইংরেজীগুলোও বলতে তাকে কিছুটা বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয়। আবারও কিছু নির্জলা মিথ্যা গল্প বানাতে হয়। গত মাহফিলের ইংরেজীটা তার বেশ পছন্দের। তিনি বলেছিলেন, 'দেশে মূর্খ লোকজনে ভর্তি। ঠিক উচ্চারণে বিসমিল্লাহ বলতে পারে না অথচ হুজুদের এসে জ্ঞান দেয়। সেদিন এক মাহফিলে পেয়েছিলাম একটা এরকম। আমার মাহফিলে এসে সে হুজুরদের বলছে হুজুররা এটা করবেন না, সেটা করবেন না। আমি তাকে বললাম, 'আপনি কে? হু আর ইউ' । সে বলে সে ঐ এলাকার চেয়ারম্যান। আমি তাকে বললাম, 'সো ব্লাডি হোয়াট? গেট আউট অফ দিস ষ্টেজ। আমরা চেয়ারম্যানদের পুছি না। এলেম নাই হুজুরদের জ্ঞান দিতে আসছেন। হুজুরদের জ্ঞান দিতে হলে সেটা দেবেন হুজুররা, আলেমরা। আপনি জ্ঞান দেয়ার কে? '

'সো ব্লাডি হোয়াট 'গালিটা মাজিদ মুনওয়ারের বেশ মনে ধরে। এটাকে তিনি আবার ব্যবহার করতে চান। খাতাটা থেকে তিনি আরেকটা বাক্য টুকে নেন। বেশ কয়েকবার প্রাকটিস করতে হবে বাক্যটা। বাক্যটা তার মাথায় ঘুরতে থাকে 'ইন্ডিয়ানদের কখনো বিশ্বাস করবেন না, জাষ্ট লাইক দেয়ার ওল্ড ফাদার দে আর অলসো গোইং টু হেল এন্ড অলওয়েজ ট্রায়িং টু মেক আওয়ার লাইফ হেল' ।

মাজিদ মুনওয়ার চোখ বন্ধ করে বিড়বিড়িয়ে বাক্যটা আওড়াতে থাকেন। 'ব্লাডি ইন্ডিয়ান'দের নিয়ে কোন গল্পটা ছাড়বেন সেটা ভাবতে ভাবতে তিনি ঝিমিয়ে পড়েন। 'দলকে বেশি করে প্রমোট করতে হবে'কথাটা তার স্মরণ হয়। ব্লাডি ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে কেন একটা দলই করতে হবে তার যুক্তি খুঁজতে খুঁজতে তিনি এই অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েন।

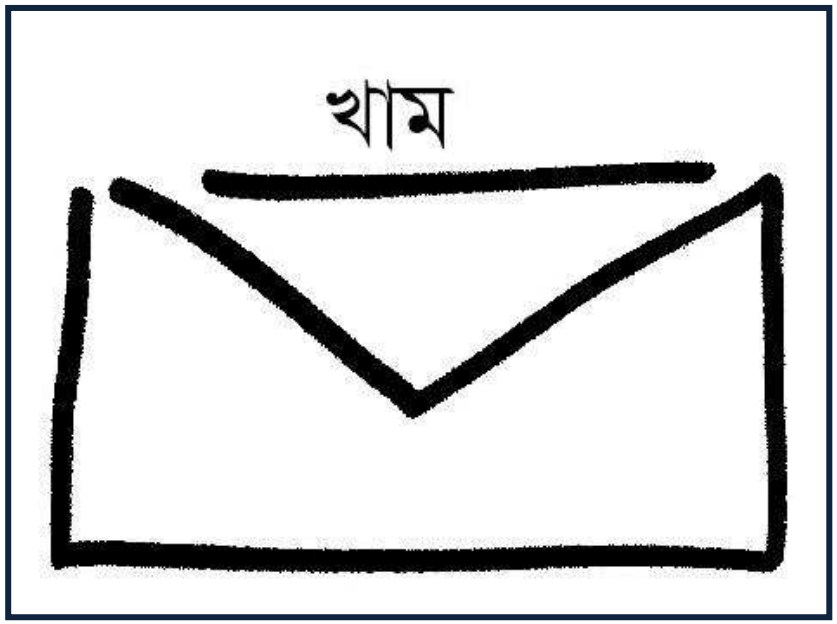

অনেকদিন পর রাতে পুরনো ডায়েরিটা পড়ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ডায়েরী। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ডায়েরী লেখাকে একটা অভ্যাসে পরিনত করেছিলাম । স্বাভাবিকভাবেই নানান নষ্টালজিক ঘটনায় ঠাসা ডায়েরীটা। সেগুলোই এতদিন পর পড়ছিলাম।ডায়েরীর ভিতর একটা খাম পেলাম । সাদা, ছোট্র একটা খাম।খামের গায়ে আকাশী বর্ণের দু-তিনটি মিকিমাউস টাইপের কার্টুন আঁকা । আমি খামটি দেখতে থাকি, পরম মমতাভরে হাত বুলোতে থাকি খামের উপর। কেন জানি চোখ ভিজে আসতে থাকে আমার।মাথা নিছু করে ছিলাম।কয়েক ফোঁটা পানি গিয়ে পড়ে আমার চশমাটার উপর। ঝাপসা হয়ে ওঠে চশমাটা। আম্মা রুমে ঢুকে আমাকে ডাকেন কিরে কি হেয়েছে চোখে পানি কেন। আমি চেয়ারে ঝুলানো গামছাটা দিয়ে চোখ আর চশমাটা মুছি।না মাথাটা ব্যথা করছিল তো তাই একটু নিক্স লাগালাম মাথায়, চোখেও গেছে বোধহয় একটু। মিথ্যা কথাটা আমাকে বলতেই হয়। সাবধানে দিবিনা, আমাকে বললেই হত লাগিয়ে দিতাম। মাথা ব্যথা করছে তো বসে আছিস কেন?আমি লাইট বন্ধ করে দিচ্ছি শুয়ে পড়। একনাগাড়ে কথাগুলো বলে আম্মা লাইট নিভিয়ে চলে যান।আমি শুয়ে পড়ি।আমার চোখে মনাদের বাড়িটা ভেসে ওঠে।

বেশ বড়ই বাড়িটা।ঢাকা শহরে এরকম বড় বাড়ি খুব একটা চোখে পড়ে না। মেইন গেট পেরিয়ে বড় একটা বাগান পড়ে । বাগানের মধ্যে প্রসস্থ রাস্তাটা দিয়ে কিছুক্ষন হাটলে তবেই মূল দালানের গেটটা পাওয়া যায়। আমি মনাকে ওদের অদ্ভুদ ডিজাইনের বড় বাড়িটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলেছিলো ওদের দাদার বানানো বাড়ি। ঐতিহ্যের খাতিরে নাকি ভাঙা হয়নি। মনাদের শ্রেনীর লোকেরা ঐতিহ্য খুব পছন্দ করে তাই আমি আর বিশেষ কিছু বলিনি। মনাদের বাড়ীতে আমাকে কয়েকদিন যেতে হয়েছিলো।

মনাকে আমি পড়াতাম, খুব বেশীদিন না অল্পদিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে মফস্বলের স্কুল শিক্ষক বাবার কাছে কয়েকমাস টাকা

নেওয়ার পর মনে হচ্ছিল না অনেক হয়েছে আর না এবার নিজেই কিছু করি। এক বন্ধুর মারফত গেলাম ওকে পড়াতে ঠিক ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বারোদিন আগে। ফাইনাল রিভিশনের জন্য যাওয়া আরকি। প্রথমদিন মনাদের বাড়ীতে ঢুকতে একটু ভয় হয় আমার। বড়লোকদের বাড়ী, আগে কখনো এরকম বাড়িতে ঢোকা হয়নি। বিশেষত ' কুকুর হইতে সাবধান ' জাতীয় কথাবার্তা আমার জানা ছিল এবং তৎসংক্রান্ত দু একটি ঘটনাও কোথাও কোথাও পড়েছিলাম। তাই বড়লোক সংক্রান্ত আমার একটা ভয় ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছু হয়নি।গেটে একজন দাড়োয়ান দাড়ানো ছিল সে আমাকে আমার নাম আর আসার কারন বলামাত্র দরজা খুলে বাগানের রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল। হয়ত আগেই বলা ছিল।আমি মনাদের বাড়িটা দেখে অবাক হয়েছিলাম, অবাক হয়েছিলাম ওদের গাড়িগুলো দেখেও। একটা পরিবারের এতগুলো গাড়ীর কি দরকার হতে পারে কিছুতেই মাথায় ঢোকেনি আমার।

মনাকে পড়ানোমাত্র আমি আবিষ্কার করলাম সে দুনিয়াসম্পর্কিত অনেক সাধারণ জিনিস দেখেনি, বোঝেও না অনেককিছু। মনা কখনো খেজুর রস খায়নি, চড়েনি নৌকায়ও। কুমড়ার ফুল দিয়ে যে বড়া বানানো যায় তা সে জানতনা। আমি বলার পর সে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল যেন আমি একটা কুখাদ্যর রেসিপি দিচ্ছি ওকে। আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে জানতে পারি পাটগাছ ও ভুট্রাগাছ নামের যে দুটি অতি পরিচিত গাছ আছে তা মনা কখনো দেখেনি। সে মনে করেছিল ভুট্রাগাছ লিচু গাছের মত বড় কোন গাছ হবে। আমি মেয়েটার কথাবার্তা শুনে হাসি, অবাকও হই। মনার সরলতা আমার ভালই লাগে। নানান বিষয়ে কথা বলতে বলতে সময় গড়িয়ে যায়, পড়ানো হয়ে ওঠে সামান্যই। আমার আর মনার গল্প শেষ হয় না।

মেয়েদের সাথে আমি আগে এরকমভাবে কখনও মিশিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ওঠার আগে যখন বাড়িতে থাকতাম তখন বলা যায় একরকম এড়িয়েই চলতাম মেয়েদের। মেয়েদের সাথে কথা বলতে কেন জানি রাজ্যের লজ্জা ভর করত আমার ওপর। আম্মা ব্যাপারটা জানতেন তাই হল থেকে যখন ছুটিছাটায় বাড়িতে যেতাম তখন জিজ্ঞাসা করতেন কি রে কোন বান্ধবি - টান্ধবি হল। আমি আম্মার কথাটার মানে বুঝতাম আর একটু মুচকি হেসে বলতাম না, হল না। তাই মনার সাথে অনবরত কথা বলার সময় মনার মাঝে মেয়েদের নতুন করে আবিষ্কার করতে থাকি আমি। কথা বলার সময় মনা অকারনে খিলখিল করে হেসে ওঠে। কোন ছেলেবন্ধু হলে আমি নিশ্চিত বিরক্ত হতাম কিন্তু মনার এরকম অসংযত, অকারন হাসি আমার ভালো লাগে, এক ধরনের ভাললাগা তৈরী হতে থাকে মনার জন্য, আগে যা কখনও হয়নি কোনো মেয়ের জন্য। আমি বুঝতে পারি আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি, কিন্তু এ দুর্বলতা আমি ঠেকাতে পারিনা।আমার খারাপ লাগতে থাকে। আমার অবস্থাগত কারনে দুর্বল হওয়ায় আমার খারাপ লাগতে থাকে, খারাপ লাগতে থাকে ছাত্রীর প্রতি দুর্বল হওয়াতেও। আমি নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকি।

বারোদিন পড়ানো হয়ে গেলে মনা আমাকে সাদা খামটি দেয়। বলে ভাইয়া আম্মু দিয়েছে। এর আগে আমি কখনো পড়ানো বাবদ

খামভর্তি টাকা নেইনি। একটু বিব্রতবোধ হয় আমার। চট করে খামটি সামনের পকেটে রাখি। মনাকে আর পড়ানো হবেনা, হয়ত দেখাও হবেনা কখনও ভাবনাটা মাথায় চেপে থাকে । মনটা ভারী হয়ে ওঠে আমার। যন্ত্রের মত পড়াই আমি, কোন গল্প হয়ে ওঠেনা সেদিন। পড়ানো হয়ে গেলে আমি বলি মনা আজকে তাহলে যাই, ভালোভাবে পরীক্ষা দিও। মনা বলে, আচ্ছা। আমি মনার কিছু বলার জন্য বৃথা অপেক্ষা করতে থাকি। মনা কিছু বলেনা, চুপ করে থাকে, ফোন আসে ফোন ধরে কথা বলতে থাকে। আমি বসেই থাকি, কেন জানি যেতে ইচ্ছে করেনা। মনা ফোন কেটে দিয়ে আমার দিকে তাকায়, আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। আমি বসে আছি কেন মনার তো কিছু বলার কথা নয়, কেউ একজন ভিতে থেকে আমাকে নাড়া দেয়। আমাকে উঠতেই হয়। আমি বলি ঠিক আছে গেলাম। দরজার দিকে পা বাড়াই আমি, মনাও দেখি দরজা পর্যন্ত আসে।আমার বুকের ভিতরটায় ধক করে ওঠে, আমি দরজায় গিয়ে দাড়াই। মনা কি কিছু বলবে, আশান্বিত আমি চেয়ে দেখি মনার দিকে। মনা বলে ভাইয়া দোয়া করবেন, চান্স পেলে খাওয়াব।আমি বলি হ্যাঁ দোয়াতো করবই। দরজার সামনের লনটাতে পা বাড়াই আমি।

মনাদের বাড়ী থেকে এই একটি খাম নিয়ে আমি ফিরে আসি। মনার সাথে আমার আর কখনও দেখা হয়নি। এই পৃথিবীতে কেইবা কাউকে মনে রাখে!মাঝে মাঝে আমি খামটা বের করে দেখতাম। মনার কথা চিন্তা করতাম, কেমন আছে বোকা মেয়েটা! আমি হয়ত তখনও বুঝিনি মনার কাছ থেকে এই একটিমাত্র খামের বেশী আর কিছু পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না।

মফা আর সাবেতের সাথে বৃদ্ধ দুইজনের দেখা হয় এক গরমের রাতে মফস্বল শহর থেকে সামান্য দূরে গ্রামের নিকটবর্তী একটি কালভার্টে ।

শীতের শেষে কেবলমাত্র গরম পড়তে শুরু করেছে । সারাদিন সূর্যের চরম চোটপাট । বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে রাস্তায় লোকজন কমতে শুরু করে । সরকারী- বেসরকারী অফিসের

কর্মচারী- কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা একটু বর্হিমুখী টাইপের তারা এসময় অফিস থেকে বাসায় ফিরে কাপড়- চোপড় বদলে সামান্য চা- নাস্তা খেয়ে বেড়িয়ে পড়ে । কেউ কেউ আড্ডা জমায় বইয়ের লাইব্রেরীতে, কাপড়ের দোকানে, ফার্মেসীর ভিতর ও বাহিরের টুলগুলোতে আবার কারো কারো আড্ডার স্থান হয়ে ওঠে হাটের সামনের চায়ের দোকানগুলো । গ্রামের লোকজন যারা হাট করতে এসেছিল মফস্বল শহরে তারা বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়, কাঁচা বাজারের দোকানগুলো বন্ধ হতে শুরু করে । সারা দিন নানান কাজের পর শহরটা যেন ঝিমানোর প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে । শুধু ব্যস্ততা বাড়ে চামড়া ব্যবসায়ীদের । সারা বিকেল গরু- ছাগলের চামড়া কেনার পর এসময় এরা হিসাব নিয়ে বসে । বিশাল আড়তের কাঁচা চামড়ার কটা গন্ধের মধ্য বসে কর্মচারীরা চামড়া টান টান করে বেঁধে লবন ছিটাতে থাকে । কাল ঢাকা থেকে মহাজন এসে ট্রাক ভরে চামড়া নিয়ে যাবে । আড়তে মহা ব্যস্ততা । ঠিক এই সময়ে নিয়ম করে দুঘন্টার জন্য বিদুৎ চলে যায় প্রতিদিন । সেচের মৌসুম শুরু হয়েছে । প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গেছে বিদুৎ। স্যালো মেশিনের পানি তোলা হচ্ছে বিদুৎ দিয়ে । এইসব মফস্বলে দেয়ার মত কারেন্ট কোথায় ?

কারেন্ট চলে গেলে শহরটা যেন আবার সন্ধ্যার পরের ক্ষনিক নিস্তব্ধতা থেকে আবার জেগে ওঠে । প্রতিটা বাসায় হারিকেন- মোমবাতি জ্বালানো শুরু হয় । স্কুল কলেজের ছাত্ররা পড়ার টেবিল থেকে বেড়িয়ে পাড়ার মোড়ে জড়ো হয়, স্থানে স্থানে সংঘবদ্ধ হয়ে আড্ডা দেওয়া শুরু করে । যাদের বাড়িতে ছাদ আছে তাদের বাড়িতে মহিলা- মেয়েরা ছাদে জড়ো হয়ে গল্প- গুজব করে । সারা দিনেই টিভি ছাড়া এটাই এদের একমাত্র বিনোদন।

মফা আর সাবেতের এ সময়টাই ভাল লাগে । এমনিতেই সারা দিন সূর্যের তাপ শূষে নিয়ে বাড়িগুলো গরম হয়ে থাকে । কারেন্ট না গেলে বাড়িতে থাকাই সমস্যা হয়ে যেত । দুইবার করে ডিগ্রী ফেল করে এরা অনেকদিন নিজেদের বাড়িতেই বোঝা হয়ে ছিল । তখন অন্যদের গরম তো এদের উপর পড়তই । এখনও অবশ্য এদের উপর গরম পড়ে তবে সেটা বাড়ির না বাজারের । শহরের কুদ্দুস মোল্লার হাটগুলোতে এরা ইজারা তোলো । কুদ্দুস মোল্লা ঝানু ব্যবসায়ী । শহরের দুই দিন বসা হাট ছাড়াও এনার ইজারা নেয়া আছে শহরের একটু বাহিরে গ্রামের দিকের দুটা হাট । মফা আর সাবেত আরও অন্যদের সাথে এই হাটগুলোতে হাটের দিন দোকানদারদের কাছ থেকে ইজারা তোলো কুদ্দুস মোল্লার পক্ষ হয়ে। শুধু কি দোকানদার, এসব হাটের গরু- ছাগল বিক্রির চালানের টাকাও রশিদ দিয়ে তোলো গরু- ছাগলের মালিকের কাছ থেকে । গরু- ছাগলের মালিকেরা বদের একশা । আপসে গরু- ছাগল বেচে চালানের টাকা না দিয়েই সটকে পড়ার ধান্দায় থাকে । মফা আর সাবেত পালাক্রমে একজন হাটের নির্দিষ্ট জায়গায় চেয়ার টেবিল আর চালান রশিদ নিয়ে বসে থাকে আর একজন চালানের রশিদ হাতে নিয়ে অনবরত ঘোরে হাটে, কোথাও কোন দরাদরি নজরে পড়লে দূর থেকে লক্ষ্য করে । গরু- ছাগল বেচে লোকজন চালান করলে ভাল, না করে সটকে পড়ার ধান্দা করলেই গিয়ে ধরে - দে জরিমানা দুইশ টাকা ! কাচা বাজারের দোকানদাররা আবার এইদিক দিয়ে ভাল, জিনিসপাতি বেচাবিক্রির নির্দিষ্ট জায়গা আছে

। প্রতিদিন এরা ঐ জায়গাতেই বসে । এদের নিয়ে মফা আর সাবেতের কোন ঝামেলা হয়না । সন্ধ্যার পর দোকান ওঠানোর আগে ইজারার টাকাটা তুললেই হল । সপ্তাহে তিন হাটের ছয় হাটবাড়ে মফা আর সাবেতের তাই প্রচন্ড ব্যস্ততা । হাটের হাজার রকমের মানুষের মাঝে মিশে ধুলা বালি আর গনগনে সূর্যের মাঝে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে এদের দিন কেটে যায় । দুপুরের আগ পর্যন্ত এরা অবশ্য ফাঁকাই । তখন কাজ বলতে কেবল প্রিতমের সেলুনে বসে ডিস্টিক্ট শহর থেকে বের হওয়া তিন টাকার নিউজপ্রিন্টের দৈনিক আজকের খবর পড়া আর আওয়ামীলীগ-বিএনপি, ইরান- আমেরিকা নিদেনপক্ষে ঘোড়াশালে নতুন পীরের পানি পড়া দিয়ে নানান ব্যায়াম নিরাময়ের ঘটনা অথবা দুলুর বাড়িতে চোরের জিনিসপত্রের সাথে ঘরে রাখা আধাখাওয়া কাঁঠাল নিয়ে যাওয়ার কথা নিয়ে এর ওর সাথে আলাপ করা ।

বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতেই মফা আর সাবেতের সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় আর কারেন্টটাও যায় এসময় । এরা তখন লুঙ্গি আর টিশার্ট পরে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে হাটতে । হাটা বলতে প্রতিদিন আসলে একই রাস্তায় হাটা । বাড়ির সামনে দিয়ে গ্রামের দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটা দিয়ে পনের- বিশ মিনিট হাটলে একটা ভাঙ্গা কালভার্ট চোখে পড়ে । মফা আর সাবেত প্রতিদিন এই রাস্তাটা ধরেই হাট থেকে গ্রামের দিকে ফিরে যাওয়া হাটুরেদের সাথে হেটে যায় কালভার্টটা পর্যন্ত । এটা বলতে গেলে শহর আর গ্রামটার সঙ্গমস্থল । বাড়িঘর তেমন একটা এদিকে নেই । দুই পার্শ্বে ফসলী জমি । কালভার্টটার উত্তর দিক থেকে এ সময় হু- হু করে বাতাস আসে যেন মনে হয় এটা ভেঙ্গেই যাবে । মফা আর সাবেতের বেশ লাগে বাতাসটা । ওরা সাধারণত কালভার্টটার একপাশে যেখানে বড় করে লাল রং দিয়ে জাকির প্লাস সবুরা লেখা আছে সেখানটাতেই প্রতিদিন বসে । হাটুরে লোকজনের কথাবার্তা শুনতে শুনতে দুজনে হাল্কা- পাতলা বিষয়- আশয় নিয়ে কথাবার্তা বলে । কখনও কখনও এদিকটায় আরও লোকজন হাওয়া খেতে আসলে তাদের সাথে কথা বলে ।

আজকে দিনটায় আকাশে অল্প- স্বল্প মেঘ ছিল । হাওয়াও পাওয়া যাচ্ছিল বেশ । কালাভার্টটাতে সাকুল্যে চারটি প্রাণী । মফা আর সাবেত রং দিয়ে লেখা জায়গাটাতেই বসেছিল । কালভার্টটের অন্যপার্শ্বে ছিল দুজন বৃদ্ধ, পরনে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেন্জী । এরা পার্শ্বের গ্রামেরই হবে বোধহয় । মফাই প্রথম কথা বলতে শুরু করে এদের সাথে ।

- চাচা খবরাখবর ভাল ।
- আর খবর জিনিসপত্রের যে দাম । মনে করেন যে আলু ভর্তা আর ডাল দিয়া তিন বেলা খাবার খালেউ চলতিছে না ।
- জিনিসের দাম তো বাড়বিই ত্যালের যে দাম বাড়তিছে ।
- হামরা তো বাপু এত কিছু বুঝিনে । আগে দিন চলতিছিল ভালোই এখন আর চলতিছে না কতা এটেই ।

পাশের বৃদ্ধ বিড়বিড় করে সূরার মত কি যেন পড়ছিলেন । এবার তিনিও মুখ খোলেন ।

- আসল কতাটা হল ঈমানের পরীক্ষা চলতিছে দুনিয়াত। আল্লাতো তো কছেই দুঃখ কষ্ট দিয়ে বান্দাক পরীক্ষা করা হবি দুনিয়াত ।

- কিন্তু খিরিসটান- নাসারারাই যে সুখ করল দুনিয়াত । ওমাগের পরীক্ষা নাই ।
- ওমাগের তো দুনিয়াতি সক কিছু, আখেরাত তো নাই । সুখতো করবিই ওমরা দুনিয়াত । ফলও পাবি, দুনিয়াতও পাবি এদিক- ওদিক দিয়ে আবার পরকালততো পাবিই। ক্যা তোমরা শেঙ্গলডাঙ্গার ঘটনাটা শোনেন নাই ।
- না কি হছে শেঙ্গলডাঙ্গাত । সাবেত জবাব দেয় ।
বৃদ্ধের মুখ চাঁদের আলোয় চকচক করে ওঠে । সেখানে একটা গল্প বলার আভাস পাওয়া যায় ।
- দিন দুনিয়ার খবরাখবর তোমরা থুবা না । সেদিনের ঘটানাই তো শেঙ্গলডাঙ্গার । এলাকাত তো হইহই পড়ে গেছিল । খবর পাননি তোমরা ?
মফা আর সাবেত একে অপরের দিকে তাকায় । না শেঙ্গলডাঙ্গার এরকম কোন খবর জানা নাই তাদের । মফা বলে ঘটনাটা কি চাচা কন তো দেখি শুনি ।
- শেঙ্গলডাঙ্গা এলাকাটা কবার গেলে খুব একটা কিন্তুক ভাল নয় । সারা উপজেলার মধ্যে ওটি মনে করেন যে হিন্দু- খিরিসটান বেশী । খিরিসটান মানসের গিরজা না কি করে কয় ওটাও আছে একটা । সারা বছর নানান জাগাত থেকে মানুষজন আসে, এটা সেটা লাগিই আছে । ঈমান কালামের অবস্থা কবার গেলে কিছুই নাই ঐ এলাকার মানসের ।
- তাই নাকি ? সাবেত বলে । নিজের উপজেলার মধ্যে এরকম একটা এলাকা আছে ও জানত না ভেবে অবাক হয় সাবেত ।
- তোমরা তো সেদিনের ছল- পল কি আর কবার পাবা এগোর কতা । হামরা এগোক দেকতিছি জন্ম থেকে । হামার নানিবাড়ীও আছিল শেঙ্গলডাঙ্গাত । ছোটত যায়া হামরা কত কীর্তিকলাপ দেখছি খিরিসটানের । অন্যবৃদ্ধও ঢুকে পড়ে কথার মধ্যে ।
মফা আর সাবেতের কৌতুহল আরো বাড়ে । দুজন একসাথে বলে ওঠে তারপর কি হল শেঙ্গলডাঙ্গাত । গল্প বলা বৃদ্ধ কোমড় থেকে লুঙ্গির মধ্যে গুজে রাখা মেস ও বিড়ির প্যাকেট বের করে ।
তাজবিড়ির প্যাকেটটা থেকে একটা বিড়ি নিয়ে বাতাসের হাত রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথা নিচু করে কৌশলে দেশলাই দিয়ে বিড়িটা ধরায়। এরপর আবার সে ঘটনাটা বলতে শুরু করে ।

- শেঙ্গলডাঙ্গার এক বড়লোক বিরাট বাড়ি বানাল । মানুষটাক হামরাও চিনতেম । সূদের কারবার আর ভেজাল ঔসধের ব্যবসা করে অনেক টেকা কামাই করছিল । মানসে ওক কত সূদে মনসূর । সেই সূদে মনসূরের বাড়িত যায়া মানসে রাড়ি দেখে হায়হায় করে । হায় হায় এত টেকা খরচা করে কেউ বাড়ি বানায় ! সূদে মনসূরও খুব খুশি । বাড়ির নাম দিল বেহেশতের বাড়ি । তোমরাই কও এটা কওয়া কি ঠিক হছিল। দুনিয়ার মানসের কি সামর্থ্য আছে বেহেশতের বাড়ি বানাবার ?

কালভার্টের চারটি লোক দুনিয়ার সামান্য লোকের এ অপার্থিব দাবিতে সমস্বরে হেসে ওঠে । কালভার্ট পার হয়ে যাওয়া হাটুরে লোকগুলোও পিছনে ফিরে দেখে কি হল । অনেকক্ষন পার হলেও তাদের হাসি থামে না । বৃদ্ধ আবার গল্প বলতে শুরু করে ।
- চারপাশের মানুষ না হয় কিছু না কবার পায়া থামে থাকল ।

আল্লাতো তো থামে থাকপে নায় । হলও তাই । একদিন ডিগিত থেকে একটা বান্দরের মতন কি জানি উটে আসল একটা । অনেকে কয় বান্দর অনেকে কয় বাঘ । সেটার নাকি যে সে শক্তি নয় ! সবার আগত গেল মনসূরের বাড়িত । ভায়ে দেখলে বিশ্বাস করবে নও তোমারা একেবারে চূর্নবিচূর্ন করে ফেলাছিল বাড়িটা । হামরা নিজে যায়া দেখে আসছি । মনে করেন যে বড় বড় গাছ যেগলা তিন পুরুষেও কাটে নি সেগলেক এক ধাক্কাত তিন চার মাইল নিয়া যায়া ফেলে দিছে । মানসের ঘরের টিনক উড়ে নিয়ে যায়া ফেলে দিছে আরেক এলাকাত । কত মানুস ঘরের টিন নিয়ে আসছে দূর- দূরান্ত থেকে । নিজের দেখা ঘটনা বাপু, কি আর কমো । মানসের কাছে যায়া শুননো কি নাকি ত্যাজ সে বান্দরের খালি রাগোত শো- শো শব্দ করছে নাকি সে রাতোত । মানষের জান নিয়া টানাটানি । খিসটানের যে গিরজাটা আছিল ওটার তো নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি পরেরদিন । কি যে করছে ওটার । মসজিদগুলের কিন্তুক আবার কিছু হয়নি, পাকা মসজিদ আছিল তো সকগুলা । যাগের খেড়ের বাড়ি আছিল তারা তো বাড়িঘর উড়ে গেলে মসজিদেই আছিল । বিশ্বেস করেন নিজ চোকে দেখা, মসজিদগুলার এনা হলেও ক্ষতি হয়নি ।

- আল্লার ঘর হয় ক্ষতি হয় ক্যামনে । অনেকক্ষন পর অন্য বৃদ্ধ বলে ওঠে ।
- হ কতা তো সেট্যাই ।
- ক্যা একই রাতত পলাশগাছিতও তো একই ঘটনা ঘটছে ।

হ শুনছিলাম পলাশগাছির ঘটনা এনা এনা । ঝড়- বৃষ্টি হছিল নাকি খুব ।

- কিসের বৃষ্টি ! ক্ষেপে ওঠে গল্প বলা বৃদ্ধ । হাওয়া। হাওয়া চষে বেড়ে শ্যাষ করছে পলাশগাছি ।

হাওয়া কিসের হাওয়া ! সাবেত জানতে চায় ।

- হাওয়া বঝলে না বাপু । আমাবশ্যার আন্ধারের নাকান মিশমিশে কালো নাকিন একটা হাওয়া । তছনছ করে দিছে সককিছু ।

হামারহেরে এলাকার অনেকেই গেছিল দেখপার । মানসে যে পন্চাশ- একশ টেকা নিয়া গেছিল ওমাগের অবস্তা দেখে তাও দিয়ে আসছে ।

অপর বৃদ্ধও মাথা নাড়ে ।

- আল্লার খেল বুঝবার সাধ্য হামাহেরে কিইবা আছে ?

তাই দুনিয়ার মানুষ খোদার খেল কিইবা বুঝতে পারবে । মফেত ও সাবেতও সম্মতির মাথা নাড়ে ।

মফস্বল শহরটাতে কারেন্ট চলে এসেছে । ধানী জমির মধ্য দিয়ে আলোর রেখার আভাস দেখতে পায় মফা আর সাবেত । শহরের সবগুলো মসজিদ থেকে একযোগে এশার নামাজের আজান ভেসে আসে । ওদের এখন বাড়ি যেতে হবে । কারেন্ট আসার পর ওরা সাধারণত আর অপেক্ষা করে না । আজ ওদের আরেকটু থাকতে ইচ্ছা করে । বৃদ্ধদের সাথে গল্প করতে ইচ্ছা হয় আরেকটু । কিন্তু দুই বৃদ্ধ ইতিমধ্যেই বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে । থাকো বাপু হামরা গেনো নমাজ পড়া লাগবি । দুই বৃদ্ধ বাড়ির দিকে পা বাড়ায় । মফা আর সাবেতও আর বসে না ।

মফা আর সাবেত দুজনে মিলে পরদিন এর- ওর কাছে খোঁজ নেয় শেঙ্গলডাঙ্গা ও পলাশগাছী নিয়ে । হাল্কা একটা টনের্ডো হয়েছিল

নাকি বছর খানেক আগে ঐ এলাকায় । মানুষের জানের তেমন ক্ষতি না হলেও মালের ক্ষতি হয়েছিল বেশ, বিশেষ করে ঘরবাড়ি আর গাছপালার । মফা আর সাবেত এ বিষয়ে তেমন কিছু জানতে পারে নি কারন ঐ সময়টায় দুইবার ডিগ্রী ফেলের ব্যর্থতা ঢাকতে ওরা ঢাকা গিয়েছিল কাজ খুঁজতে এবং যথারীতি ব্যর্থ হয়ে একসাথে ফিরে এসেছিল তের দিন পর।

প্রতিদিন সকালের রোদ মুখে আসার পর আমার ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। কিন্তু আজই প্রথম এর ব্যতিক্রম হয়ে গেল। আর মাত্র মাস খানেক পরই আমার ফোর্থ ইয়ার অনার্স ফাইনাল। সারাবছর বলতে গেলে কোন পড়াশোনাই হয় না। তাই পরীক্ষার আগের এই একমাসই ভরসা। কয়েক দিন যাবত অনেক রাত জেগে পড়তে হচ্ছে। সকালের দিকে এমন ঘুম আসল যে যখন বিছানা থেকে

উঠলাম তখন বারোটা পেরিয়ে গেছে। সকালের ক্লাসটা মিস হয়ে গেল। অবশ্য ক্লাস করে যে খুব একটা লাভ হয় তা নয়। পরীক্ষার আগে গুটিকয়েক প্রথাগত প্রশ্ন পড়েই যদি বেশ চলে যায়, ক্লাস করেই তবে কী লাভ। তবুও আমি যে নিয়মিত ক্লাসে যাই সেটার জন্য একটা কারণ আছে। সেটা না হয় একটু পড়ে বলা যাবে।

হলের সরু প্যাসেজ দিয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছি। পাশের রুমের জালাল জিজ্ঞেস করল, মামু কি খবর, গল্পটা পড়ছ তো? জালাল আমার ভাগ্নেগোছের কেই নয়। তবুও সে আমাকে ও নামেই ডাকে, যদিও এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। এজন্যই ভাগ্নের আবদার হিসেবে আমাকে তার লেখা কিছু অখাদ্য গল্প-কবিতা পড়তে দেয়। আমি অবশ্য গল্প-কবিতার তেমন কিছু জানি না। তারপরও অখাদ্য বললাম, কারণ আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি জালালের গল্প-কবিতার একমাত্র পাঠক আমিই এবং সে শত চেষ্টা করেও এ জিনিস আর কাউকে গেলাতে পারেনি। আমি বললাম, বেশ ভালই হয়েছে, চালিয়ে যাও। জালালের চোখমুখ দেখে মনে হলো সে বেশ অনুপ্রাণিত হয়েছে অনেকটা। সকালের নাস্তাটা করতে হলো নুরুর দোকান থেকে। অবশ্য এটাকে সাকলের নাস্তা বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ঘড়িতে দেখলাম প্রায় একটা বাজে। দুপুরে একটা ক্লাস আছে, যেতে পারলে নিম্মির মুখটা অন্তত একবার দেখা যেত। এই মেয়েটাকে আমি গত পাঁচ বছর ধরে ভালবেসে আসছি, কিন্তু কখনো বলতে পারিনি। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব দুর্বল মানুষ। এতটাই দুর্বল যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরের বছরেই যখন আমার বাবাকে ছেড়ে মা দ্বিতীয় বিয়ে করলেন তখন তার প্রতি রাগ করতে পারলাম না। সুতরাং আমি যে নিম্মিকে আগামী কয়েক মাসেও বলতে পারব না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু জীবন তো থেমে থাকবে না। হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিয়ে-শাদী করে জীবন যাপন করব। তারপর একদিন হঠাৎ রাস্তায় তার সাথে দেখা হলে মনে মনে ভাববো এই মেয়েকে আমি একসময় ভালোবাসতাম, সে কি কখনও সেটা জানার চেষ্টা করেছিল। এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আতিফ ইকবাল একটা জলন্ত-সিগারেটকে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

নুরুর নাস্তা এসে পড়েছে। নাস্তা বলতে একটা পেটকাটা রুটির ভেতরে ডিমপোচ। শুনলে হয়তো অনেকে বিশ্বাস করতে চাইবে না যে আমি এই একই নাস্তা গত চার বছর ধরে সকাল থেকে খেয়ে আসছি। ব্যাপারটা এতটাই একঘেয়ে হয়ে এসেছে যে এই একঘেয়েমোটাকে আর একঘেয়েমো বলে মনে হতে চায় না। শহীদুল্লাহ হলের ছাত্রদল সভাপতি সেলিম এসে আমার পাশে বসল। রাজনীতি বিষয়ক ব্যাপারগুলোতে আমি মোটামুটি নিরপেক্ষ থাকার ভান করি এবং চেষ্টা করে যাই যাতে সব নেতার মত জুগিয়ে চলা যায়। সেলিম হলের ছিটের ব্যাপারে কি যেন সব জটিল হিসাব বোঝাতে চাইল তার আগাগোড়া কিছুই বোঝা গেল না। তবে যেটুকু বোঝা গেল তাতে এটা স্পস্ট হওয়া গেল যে, আগামী বছর থেকে যাতে বিরোধী কোন দলের ভর্তিকৃত নতুন ছাত্র হলের ছিটে ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারে তারা দেখবে। সেলিমকে এক কাপ চা খাইয়ে আমাকে নিস্তার পেতে হলো। দুপুর আড়াইটায় শহীদুল্লাহ হলের

গেট পেরিয়ে বিজ্ঞান ভবনের দিকে রওয়ানা হলাম। নিম্মির টয়োটা করলাটাও এসে পড়েছে। গেটের সামনে বিশ্বজিৎ দাঁড়িয়ে আমড়া খাচ্ছে। আমাকে দেখে আমড়ার দুটো ফাল এগিয়ে দিল। শালীর বেসটা দেখছস, জোশ - একটা লোভী ভঙ্গিতে কথাটা বলল বিশ্বজিৎ। এই বেসটা জিনিসটা যে কি সেটা আমি বেশ ভালভাবেই বুঝি, অন্য সময় হলে হয়ত এরসাথে আমিও দু'একটা জিনিস যোগ করতাম, কিন্তু নিম্মির টয়োটা করোলার ড্রাইভারকে দেখে নিবৃত্ত হলাম।

নিম্মির সাথে আমার পরিচয় হবার ঘটনা যতটা স্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল ততটা স্বাভাবিকভাবে হয়নি। মফস্বলের একটা কলেজ থেকে পাশ করে সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল পরিবেশে এসেছি। প্রথম দিনে বিজ্ঞান ভবন খুঁজতে এসে অন্য বিল্ডিং- এ ঢুকে পড়লাম। এদিক- ওদিক ক্লাসরুম খুঁজছি, এমন সময় একটা মেয়ে এসে বিজ্ঞান ভবনটা কোনদিকে হবে জানতে চাইল। চিন্তা করে দেখলাম যদি বলি জানি না তবে সেটা প্রেস্টিজের জন্য খুব একটা সুবিধা হবে না। নিরুপায় হয়ে পার্শ্বের একটা বিল্ডিং দেখিয়ে দিলাম। ক্লাস শেষে বেরিয়ে আসছি এমন সময় দেখলাম মেয়েটিও আমাদের সাথে বেরিয়ে আসছে। তবে আমাকে দেখে তার বান্ধবীকে যে কথাটা বলল সেটা মোটেও শ্রুতিকর কিছু হল না। শুনতে পারলাম বান্ধবীকে বলছে, আমাদের সাথে তো দেখছি একটা গাধাও ভর্তি হয়েছে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এভাবে এবং আমি নিশ্চিত নিম্মি আজ পর্যন্ত আমাকে গাধার চেয়ে উচ্চতর কোন প্রাণী মনে করে না।

বিশ্বজিৎ এর সাথে কথা বলতে বলতে ক্লাসের মিনিট পনের খেয়ে ফেললাম। বাকী তিরশি- চল্লিশ মিনিট ক্লাস করব কিনা ভাবছি, এমন সময় দেখলাম বাক্কু সুমন আমায় দেখে এগিয়ে আসছে। ভাবলাম, যাক আজ আর ক্লাস করতে হবে না। সামনের দিকে কিছুটা ঝুকে হাটে বলে একে আমরা বাক্কু নামে ডাকি। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ হলো নামকরা আতেল। বাংলাদেশে তো অবশ্যই, পৃথিবীতে সম্ভবত খুব কম জিনিসই আছে যেটা সে জানে না। অবশ্য সে জানাটা যে কতখানি বিশুদ্ধ সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার মুখোমুখি হলেই সে একটা বিষয় নিয়ে লেকচার দেয়া শুরু করবে, যেটার স্থায়ীত্ব কম করে হলেও মিনিট বিশেক হবে। আমি বাক্কু সুমনকে কাটানোর জন্য করিডরে লুকিয়ে পড়লাম। ক্লাস শেষে নিম্মি বের হয়ে আসল। আমি কাধে ঝোলানো ব্যাগ একটা নোট বের করে নিম্মিও দিকে এগিয়ে দিলাম। নিম্মি তোমার ক্লাস নোট। কাজ শেষ? শেষ না, শেষের শুরু। মানে? মানে কপি শেষ পড়া বাকী। ওহ্, তাই বল। বাসায় যাচ্ছ? বাসায়ই যাচ্ছিলাম, কিন্তু রফিকটা জোড় করে ধরেছে। বলাকায় কী জানি একটা নতুন ছবি এসেছে, ওরা সবাই মিলে দেখবে। আমারও নাকি টিকেট কেটেছে। ওদের সাথে যেতে হচ্ছে। ও, আচ্ছা। নিম্মির সাথে কথাবার্তা মোটামুটি এরকম একটা গতানুগতিক রূপ নিয়েই এগিয়ে যায় প্রতিদিন। অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সাথে যে রকম ঘনিষ্টতা আমার সাথে, যেন ততটাই দূরত্ব নিম্মির। আমাদের কথাবার্তা মূলত দু'চারটা নোট আদান প্রদান বিষয়কই হয়। ছাত্র হিসেবে আমাকে অনেকেই ভালো কিংবা অনেকে ব্রিলিয়ান্ট বলে থাকে। তবে ভালো ছাত্রের যেরকম বৈশিষ্ট্য থাকা উচিৎ সেরকম কিছু আমার কাছে নেই। তবে একটা জিনিস যেটা আছে সেটা হলো

স্মরণশক্তি। অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার আগে একমাস ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়া মুখস- করি আর পরীক্ষার হলে ঢেলে দিয়ে আসি। আশ্চর্য হয়ে আমি লক্ষ্য করেছি, এতেই আমি অবলীলায় ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড, থার্ড কিংবা একবার তো ফার্স্টই হয়ে গেলাম। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমার যে ঘনিষ্টতা আছে সেটা অনেকটা নোটের সূত্র ধরেই। এই পাঁচ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে কেউ আজ পর্যন্ত- আমাকে বলেনি, দোস্ত, চল একটা ছবি দেখে আসি কিংবা দোস্ত- রূপার অথবা নিলার জন্য একটা চিঠি লিখে দে। নিম্মির সাথে আমার যে সামান্য কথাবার্তা হয় সেটা নোটের মাধ্যমেই। কতবার মনে হয়েছে নোটের ভিতরে লাল কালিতে লিখে দিই, নিম্মি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু কখনই লেখা হয়নি, সম্ভবত কোনদিন হবেও না। কতবার মনে হয়েছে নোট নেয়ার সময় একবার নিম্মির হাতটা ছুঁয়ে দেখব কিন্তু আমি দুর্বল মানুষ, সুতরাং সে সৌভাগ্য আমার কখনই হয়নি। তবুও মনে মনে ভাবতাম থাক, যাকে ভালোবাসি তাকে তো প্রতিদিন একবার অন্তত দেখতে পারছি। ক্লাস, প্র্যাকটিকাল কোনটাই না করে আমি ধানমন্ডির দিকে রওয়ানা হলাম। কাল আমার জন্মদিন। চার বছর হলো জন্মদিনের একদিন আগে প্রতিবছর আমি ধানমন্ডিতে একবার ঘুরে আসি। এখানে আমার মা তার স্বামীর সাথে বাস করেন। প্রতি বছর এই দিনে আমার মনে হয় তাকে গিয়ে একবার বলি, আমার জানতে ইচ্ছা করে আমার বাবা কে? আমার জন্ম নিয়ে আমার বাবার এক ধরণের সন্দেহ ছিল। আমি জন্মানোর আগ পর্যন্ত- এই লোকটা নাকি জানতো তার দ্বারা কখনও সন্তান উৎপাদন সম্ভব নয়। সুতরাং আমার পঁচিশ বছরের জীবনে আমি কখনই আমার বাবা- মাকে হাসি মুখে কথা বলতে দেখিনি। অবশ্য আমি যে আমার মাকে এই প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, আমি জানি এটা স্রেফ যাওয়ার ইচ্ছা বলে যাওয়া। আমার দ্বারা কখনই মাকে এরকম কথা বলা সম্ভব নয়। গত চার বছরের মতো এবারও হয়ত আমাকে বাড়ীর গেট থেকেই ফিরে আসতে হবে। তবুও যাওয়া বলেই যাচ্ছি। ফোর্থ ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষাটা বেশ ভালই হল। সম্ভবত এবারও ফার্স্ট ক্লাস থাকবে। সামনে অনেক অবসর। আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে আমি হলেই পড়ে আছি। পরীক্ষা শেষে সবাই বাড়ীতে চলে গেছে, হল অনেকটা ফাঁকা। দু'একজন ছাত্রকে পড়াই আর পাবালিক লাইব্রেরীতে পড়ি। বিকেলটায় অনেক সময় নিম্মির বাড়ীর গেট থেকে বা আমার মায়ের বাড়ীর গেট থেকে ঘুরে আসি।

চৈত্রের এক দুপুর। সকাল থেকে না খেয়ে বিছানায় পড়ে আছি। হলের ডাইনিং বন্ধ, বাইরে যেতে ইচ্ছা করছে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। একটা লাল করোলা শহীদুল্লাহ হলের গেটে থামল। একটা লাল শাড়ী পরা সুন্দর মেয়ে গাড়ি থেকে নামল। মেয়েটাকে একবার দেখে অন্যদিকে তাকানো যায় না। তবুও আমি চেষ্টা করে দৃষ্টি বড়ই গাছের ডালে বসা কাকের গায়ে ফেললাম। দুটো কাক একটা ডালে বসে আছে। ওরা কী স্বামী- স্ত্রী নাকি প্রেমিক- প্রেমিকা। কা কা করে একটা কাক উড়ে গেল, সাথে সাথে অন্য কাকটাও তার পিছু নিল।

দরজায় ঠক্ ঠক্ করে করার শব্দ হচ্ছে। উঠে গিয়ে দরজা খোলার ইচ্ছে হচ্ছে না। বললাম কে, কাকে চান? এখানে কি আতিক ইকবাল থাকেন? মেয়ে মানুষের কন্ঠ শুনে উঠতেই হল। দরজা

খুলে দেখি একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা সবুজ খাম। মেয়েটা যে কে সেটা চেনার জন্য আমাকে একটু কষ্ট করতে হলো। পরে বুঝলাম এটা নিম্মিই। একটা মেয়ে সেলোয়ার থেকে শাড়ী পড়লে যে পুরো পাল্টে যায় সেটা প্রথম বুঝলাম নিম্মিকে লাল শাড়ী পড়তে দেখে।

আরে তুমি - আমি হন্তদন্ত হয়ে বললাম। নিম্মি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। একটা কাঠের চেয়ারে বসে হেসে হেসে বলতে লাগল, তুমি তো কোন খোঁজ নাও না, তাই আমাকেই আসতে হলো। আমি কী বলব বুঝতে না পেরে মাথা চুলকাতে লাগলাম। নিম্মি একটা সবুজ খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলো। খামটা দেখেই আমার বুঝা উচিৎ ছিল এটা কীসের। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না, বোঝার জন্য খামটা খুলতে হলো। নিম্মির বিয়ে, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। আমি গালদুটো প্রসারিত করে হাসার চেষ্টা করতে লাগলাম যেন এসময় হাসাই উচিৎ। কিছু বলার মতো খুঁজে না পেয়ে বললাম, পাত্র ভাল, তুমি সুখী হবে। কথাটা শুনে নিম্মি তার মুক্তোর মতো দাঁতগুলো বের করে হাসতে লাগল। কতদিন আমার বলতে ইচ্ছা হতো নিম্মি তোমার হাসিটা দেখলে বুঝা যায় আসলেই মানুষ হাসতে পারে; কিন্তু কোনদিন বলা হয়নি। আজ এ ইচ্ছাটা বড় বেশী করতে লাগল। কিন্তু আজও বলা হলো না। সব কথা কী বলা যায়।

- তুমি আসবে। অবশ্যই, আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম যেন আমি না গেলে তার বিয়েই হবে না।

- আমাদের কত কিছুই বলার ছিল, কিছুই বলা হয়নি, না? নিম্মি এই যে কথাটা বলল, আমি এটার কোন অর্থ ধরতে পারলাম না। - একটা কথা আমরা ছয় বছরেও বলতে পারলাম না, না? এ কথাটাও আমার বোঝার কথা; কিন্তু আমার মনে হতে থাকল নিম্মি ভুল বলছে।

- একবার তুমি আমাকে ছুঁয়েও দেখবে না? আমার খুব ইচ্ছে হলো নিম্মিকে একটু ছুঁয়ে দেই। আমি হাত ওঠানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু আবিস্কার করলাম কী যেন একটা অদৃশ্য জিনিস আমার হাতকে আটকে রেখেছে। আমার খুব বলতে ইচ্ছা হলো, নিম্মি তোমাকে ভালোবাসি।

নিম্মি ঘর থেকে ধীরপায়ে বেরিয়ে গিয়ে লাল টয়োটা করোলাটাতে উঠলো। আমি জানালা দিয়ে নিম্মির যাওয়া দেখতে লাগলাম। আমার হাতে সবুজ খাম। আমি খামটা খুলতে লাগলাম, অনুভব করলাম কেউ যেন আমার ভালোবাসাকে এই খামে আটকে ফেলেছে।

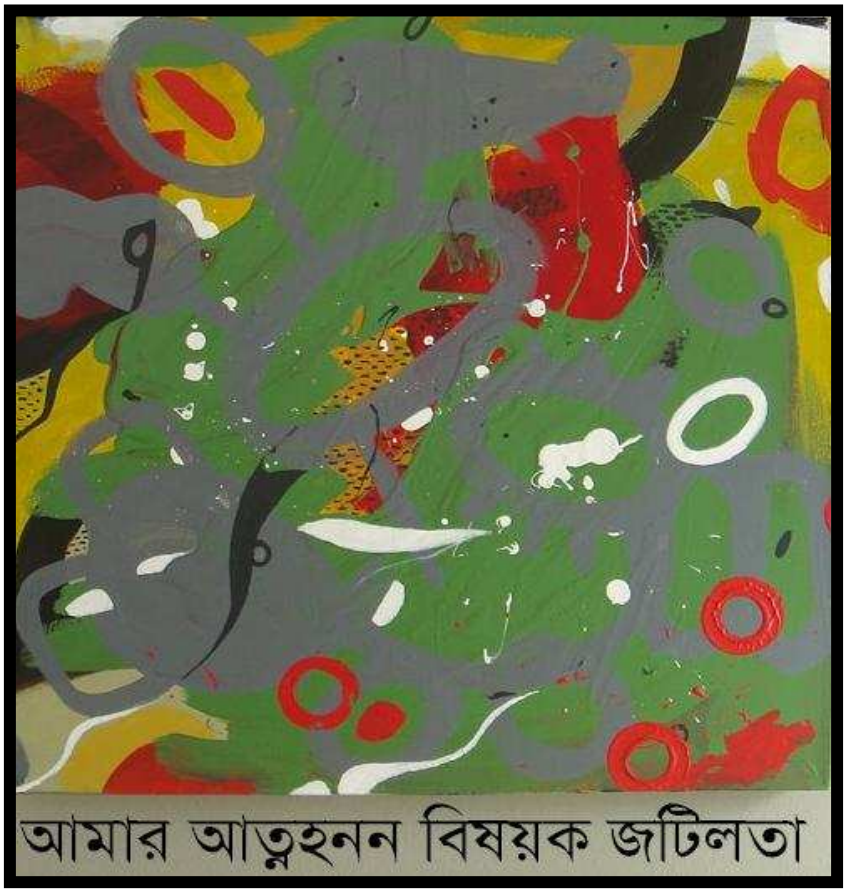

তৃতীয়বার আত্মহত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আমার হতাশা আরো প্রগাঢ় হওয়া শুরু করল।

আমেরিকা থেকে যখন দেশে ফিরে আসতে হল তখন আমি দেখলাম আমার চারপাশের সবকিছুই কেমন যেন পাল্টে গেছে। বন্ধুবান্ধব আগে যারা ছিল তাদের অনেকেই দেশের বাহিরে, দেশে যারা আছে তারা বিয়েসাদি করে সন্তান- সন্ততি নিয়ে থিতু হয়েছে। প্রথমদিকে এরা অনেকেই আসত আমার সাথে দেখা করতে। সান্ত্বনা দিত, বলত দেখিস একসময় দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। অনেকেই এসে আমাকে দেখে বলার মত কোন ভাষা খুঁজে পেত না। এখন কেমন লাগছে, শরীরের কি অবস্থা এরকম দুচারটা কথা বলে চা-নাস্তা খেয়ে চলে যেত। শুধু বন্ধুবান্ধবই নয় নানান রকম লতায়-পাতায় আত্মীয়স্বজন, পাড়া- প্রতিবেশী যাদের সাথে গত দশ বছরেও কোন যোগাযোগ হয়নি তারাও আসত। বলত ভাগ্যকে কি আর কখনও খন্ডানো যায় দেখ দেশেই কিছু করা যায় কিনা, বসে থেকো না মনের উপর চাপ বাড়বে - এইসব কথাবার্তা আরকি। এইসব হল ভদ্রলোকের কথা। অভদ্রলোকের কথাও কিছু কিছু কানে আসত আমার। মোড়ের চায়ের দোকানদার সেদিন নাকি আমাদের বাসার কাজের ছেলেটাকে বলেছে "হইব না আম্রিকা নানান বেজাতের দ্যাশ, ঐহানে কার লগে কি করছে কে জানে, সব পাপের ফল, আল্লার বিচার"। হ্যাঁ, আল্লার বিচার নিয়েই আমি দেশে ফিরে এসেছিলাম।ধীরে ধীরে আমাকে দেখতে বন্ধু- বান্ধব ও পরিচিত লোকের আসা যাওয়া কমে যেতে শুরু করেছিল এবং এখন বলতে গেলে আর কেউই আসে না।

মিশিগানে থাকার সময়ও দেশে আমার বাসায় আমার জন্য আলাদা একটা ঘর ছিল। আমার সব ব্যবহৃত পুরানো কাপড়-চোপড়, বইপত্র, ক্রীড়া - সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পাওয়া পুরস্কার ও সনদগুলো মা সাজিয়ে রাখতেন। মাঝে মাঝে আমাকে মনে পড়লে নাকি তিনি এগুলো পরিস্কার করতেন আর আমার স্মৃতি

হাতড়াতেন।এবার দেশে আসার কিছুদিন পরই আমার স্মৃতিধন্য ঘরটি ছেড়ে দিতে হল, আশ্রয় নিতে হল ছাদের একটা চিলেকোঠার ঘরে। ছোটভাই নতুন বিয়ে করেছে ওর নাকি একটা বড় রুম দরকার। আমি আপত্তি করলাম না। আসলে বুঝতে পারছিলাম আমি ধীরে ধীরে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ছি। এরকমই হয়! ছাদের ঘরটিতে আমি আমার আলাদা জগত তৈরী করে নিয়েছি। তিন বেলা নিচ থেকে খবার আসে আর আমি চৈত্রের দুপুরে শহরের কাকদের সাথে আড্ডা দেই।সময় কাটে বড় বিষন্নতায়। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে বন্ধুদের কথা, স্মৃতি হাতড়াই ওদের সাথে তোলা ছবিগুলোতে, আমার জন্মদিনে ওদের দেয়া উপহারে। পনেরটার মত বিশেষ বই আছে আমার, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার সময় চাপ কমানোর জন্য এগুলো আমি পড়তাম। এদেরকে আমি বলতাম চাপরোধীবিদ্যা। মাঝে মাঝে এই বইগুলোই বারবার পড়ি, চোখ ভিজে আসে আমার।

আমার পরিচিত পৃথিবী যে পাল্টে গেছে, চেনা মানুষগুলো অচেনা ঠেকছে এর কারন একটাই- আমি আমেরিকাতে পড়তে গিয়ে দুইপা হারিয়ে ফিরে এসেছি। লং ড্রাইভে যাচ্ছিলাম আমি আর আমার এক বন্ধু। প্লেয়ারে চলছিল আমার পছন্দের গান জন ডেনভারের i am leaving on a jet plane dont know when i will back again……। আসলেই আমি জানতাম না এভাবে আমাকে ফিরে আসতে হবে।লরিটা নাকি বেশ বড়ই ছিল।অনেকে বলেছে বেচেঁ আছি এটাই নাকি ভাগ্য(!)। আমি আমার পাদুটো হারালাম সাথে আমার বন্ধুটিকেও।মাঝে মাঝে ভাবি ঐসময়ে বন্ধুটির চলে গেলেই ভাল হত, দেশে এসে ঝামেলা করতে হতনা। আমি আমার কাটা পাদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকি। চোঁখ চকচক করে ওঠে। আগে রাস্তঘাটে পঙ্গু লোকজন দেখতাম। একজন ভিক্ষুককে পঙ্গু দেখলে আমার কোন অসুবিধা হত না কিন্তু মধ্যবিত্ত গোছের একজন শিক্ষিত যখন দেখতাম স্ক্র্যাচ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বা বেমানানভাবে বসে যাচ্ছে রিকসায় তখন আমার মনের মধ্যে একধরনের প্রশ্ন জাগত এই লোকটা বেঁচে আছে কেন?বেঁচে থেকে সে কি পাচ্ছে? দুনিয়ার হাজারো লোকের অস্বাভাবিক দৃষ্টি উপেক্ষা করে সে কিভাবে বেঁচে আছে তা কিছুতেই মাথায় ঢুকত না আমার, বিকলঙ্গতার চেয়ে আত্নহননই শ্রেয় মনে হত আমার।

হ্যাঁ, আত্নহত্যাই শ্রেয় এটা আরও বেশী করে মনে হল যখন আমি পাদুটো হারালাম। বিদেশে পড়তে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম ওগুলোর একটা গতি হওয়া দরকার, বাবা মাকে একবার অন্তত দেখে মরি এরকম সাত পাঁচ ভেবে আমি কায়েস হাসান যে কিনা যথার্থ মানুষ হওয়ার জন্য ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পড়তে গিয়েছিলাম সেই আমি দেশে মৃত্যুর জন্য ডিসেম্বরের এক শীতের সকালে স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে ঢাকায় পৌছালাম।

প্রথমদিকে আমি ভেবেছিলাম আত্নঘাতি হওয়াটা এমন কঠিন কিছু হবে না, বিশেষত নাস্তিক ধরনের লোকের যখন পরকালের কোন চিন্তা নেই। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ব্যাপারটা যত সহজ হবে বলে চিন্তা করেছিলাম ততটা সহজ হচ্ছে না। আমি প্রথমে ফাঁস দিয়ে চেষ্টা করলাম। ছাদে কাপড় শুকাতে দেওয়ার রশি ফ্যানের সিলিংএ বাঁধলাম। কিন্তু আমার মনে হল সুইসাইড নোট বিষয়ক কিছু লেখা হয়নি, বাসার লোক ঝামেলায় পড়বে। খাতা- কলম

নিয়ে বসে পড়লাম। কেন জানি কিছুই লেখা হল না। ঝিম মেরে বসে থাকলাম কিছুক্ষন। মাথার ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। দ্বিতীয়বার আত্বহত্যার চেষ্টাটা খুবই হাস্যকর ছিল। শ্বাস বন্ধ করে ছিলাম একটানা অনেকক্ষন। চিন্তা করেছিলাম এভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মারা যাব। কিন্তু সবাই জানে এভাবে মরা যায়না।আমেরিকাতে আমি নানাভাবে মানুষের আত্বহত্যা দেখেছি। কেউ হাতের শিরা কেটে সব রক্ত বের করে মরেছে, কেউ গ্যাসের চুলার জ্বলন্ত শিখার নিচে মাথা দিয়ে মরেছে। দ্বিতীয়বার ব্যর্থ আত্বহনন প্রচেষ্টার পর আমি বুঝতে পারলাম এরকম কোনভাবেই আমার হবে না। তাই শেষবার আমি খুব কাপুরুষতার সাথে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে আত্বহননের কথা ভাবলাম। পানিভর্তি একটা কাচের গ্লাসে গুনে গুনে পনেরটি ট্যাবলেট মিশিয়ে আমি বসে থাকি, আমার চিলেকোঠার ঘরের ঘড়িটিতে সময় গড়িয়ে যায়, রাস্তার মোড়ের কুকুরটি করুনসূরে ডাকতে থাকে আমার মরা হয় না।

পঙ্গু, অপাংক্তেয়, বিচ্ছিন্ন এই আমি একটি আত্বহত্যার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকি।

সমাপ্ত